দাম : বারো টাকা

কমিউনিস্টদের হাতে
পেনসিল ছাড়া আর
কিছুই রইল না
—পৃঃ ১১

স্বস্তিকা

সত্তর বছরে বিপ্লবীর
হৃদয় থেকে পায়ে
নেমেছে গীতা
—পৃঃ ২৬

৭২ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা।। ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।। ১১ ফাল্গুন - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com

বাজেট ২০২০-২১
বৈভবশালী ভারত নির্মাণের প্রথম ধাপ

কোণঠাসা বামেদের বইমেলায় বেলাল্লাপনা

জনবার্তার স্টলের সামনে
অতিবামপন্থীদের মারমুখী আন্দোলন

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্টলে আক্রমণের পর
পুলিশি প্রহরা।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ২৫ সংখ্যা, ১১ ফাল্গুন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

২৪ ফেব্রুয়ারি - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সিএএ শরণার্থীদের রক্ষাকবচ ▯ ধীরেন দেবনাথ ▯ ৬

বাইডেনকে পিছনে ফেলে বার্নি স্যান্ডার্স ডেমোক্র্যাট ফ্রন্ট রানার ▯ শিতাংশু গুহ ▯ ৭

নির্বাচনী সাফল্য কি বদলে যাওয়া আপকে দীর্ঘমেয়াদি শক্তি জোগাবে? ▯ ইন্দ্রজিৎ হাজরা ও রাহুল শিবশঙ্কর ▯ ৮

কমিউনিস্টদের হাতে পেনসিল ছাড়া আর কিছুই রইল না ▯ সুজিত রায় ▯ ১১

ভারতের বুদ্ধিজীবীরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে অগ্রাহ্য করে থাকেন ▯ ধনঞ্জয় মহাপাত্র ▯ ১৩

পুলিশ প্রমাণ করল তারা হিন্দুবিদ্বেষী ▯ মণীন্দ্রনাথ সাহা ▯ ১৫

চৈতন্যের সন্ধানে বিজ্ঞান ▯ গিরিজাশঙ্কর দাশ ▯ ১৬

বইমেলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও জনবার্তার স্টলে অতিবামপন্থীদের হামলা ▯ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ▯ ২৩

কোণঠাসা বামেদের বইমেলায় বেলাল্লাপনা ▯ দেবাশিস লাহা ▯ ২৪

সত্তর বছরে বিপ্লবীর হৃদয় থেকে পায়ে নেমেছে গীতা ▯ দেবতনু ভট্টাচার্য ▯ ২৬

সাক্ষাৎকার : 'আর এস এসের চামড়া গুটিয়ে দেব আমরা' ▯ ২৮

পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে ▯ চন্দ্রচূড় গোস্বামী ▯ ৩১

নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা মহামুনি ভরত ▯ অমিত ঘোষদস্তিদার ▯ ৩৩

বাঙ্গলার ব্রত ও গৃহিণী নির্মাণ ▯ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ৩৫

শিবপূজার অর্থ ▯ পূর্বা সেনগুপ্ত ▯ ৩৯

এবারের বাজেট যেন ভগবানের আশীর্বাদ ▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ৪৩

বাংলাদেশে হিন্দুদের ধর্মান্তরণের ঘটনা বাড়ছে ▯ ৪৫

'কাশী এক, রূপ অনেক' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ▯ ৪৯

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ▯ **অঙ্গনা : ২১** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ২২** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ২৯-৩০** ▯ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ▯ **চিত্রকথা : ৪২** ▯ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৪৮** ▯ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

প্রকাশিত হবে
২ মার্চ
২০২০

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২ মার্চ
২০২০

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

কার হয়ে কথা বলছেন রাহুল?

সম্প্রতি পুলওয়ামায় পাক জঙ্গিদের হামলায় সি আর পি এফ জওয়ানদের হত্যাকাণ্ডের বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপিত হলো। ভারাক্রান্ত মনে বীর জওয়ানদের স্মৃতিচারণ করেছে সারা দেশ। ব্যতিক্রম রাহুল গান্ধী এবং মহম্মদ সেলিমের মতো কয়েকজন। রাহুল গান্ধী প্রশ্ন তুলেছেন, পুলওয়ামার ঘটনায় সবথেকে উপকৃত হয়েছেন কে? মহম্মদ সেলিমের বক্তব্য : পুলওয়ামা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কোনো দরকার নেই।

এইসব মন্তব্য ঘিরে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। প্রশ্ন উঠছে, এরা কার হয়ে কথা বলছেন? আগামী সংখ্যায় উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবে স্বস্তিকা।

সত্বর কপি বুক করুন।। দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank -
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সেকুলার নহে, হিন্দুবিরোধী

সদ্য অনুষ্ঠিত কলিকাতা পুস্তক মেলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রটিতে হামলা সংঘটিত করিয়াছে কিছু অতি বামপন্থী যুবক-যুবতী। অবশ্য সকলেই যুবক-যুবতী ইহা বলিলে ভুল হইবে। হামলাকারীদের ভিতর কতিপয় পক্বকেশ বামপন্থীকেও দেখা গিয়াছে। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিপণীতে এই হামলা। ভাবখানা এমন যেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ওই পুস্তক বিপণী হইতেই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনটি প্রণয়ন করা হইয়াছে। হামলাটি অবশ্য শুধুমাত্র বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উপরই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। হামলাটি শেষ পর্যন্ত সংঘটিত হইয়াছে হিন্দুধর্ম, দর্শন এবং সংস্কৃতির উপর। হিন্দুর ধর্মীয় ভাবাবেগকে ওইদিন আঘাত করিয়াছে অতি বামপন্থী উচ্ছৃঙ্খল যুবক-যুবতীর দল। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিপণীতে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার উপর পদাঘাত করিয়া হিন্দুর আবেগকে লাঞ্ছিত করিতে চাহিয়াছে ইহারা। মধ্য প্রাচ্য হইতে আগত মুসলমান শাসকরা একসময় এই ভাবেই হিন্দু মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া হিন্দুধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতিকে চূর্ণ করিতে চাহিয়াছিল। পুস্তক মেলার এই উচ্ছৃঙ্খল অতি বামপন্থী যুবক-যুবতীর আচরণ সেই মহম্মদ ঘোরির মতো অত্যাচারী, উচ্ছৃঙ্খল বিদেশি আগ্রাসনকারীর কথা মনে করাইয়া দিতেছে। ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই তুলিয়া এই অতি বামপন্থীরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পদাঘাত করিয়াছে। অথচ পুস্তকমেলায় যে নির্বিবাদে বাইবেল ও কোরান বিলি করা হইয়াছে—এই ধর্মনিরপেক্ষ ভণ্ডরা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। খ্রিস্টান এবং মুসলমানরা যদি পুস্তকমেলায় তাহাদের ধর্মগ্রন্থ বিনাবাধায় বিলি করিতে পারে, তাহা হইলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিপণীতে শ্রীমদ্ভগবদ গীতা ও হনুমান চালিশা বিক্রয় করিবার সম্পূর্ণ অধিকার হিন্দুদেরও রহিয়াছে। তদুপরি এই অর্বাচীন হামলাকারীরা ইহাও জানে না শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা নিছক একটি ধর্মগ্রন্থ নহে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহনদাস করমচাদ গান্ধী, বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ কেহই গীতাকে একটি নিছক ধর্মগ্রন্থের আখ্যা দেন নাই। তাঁহারা প্রত্যেকেই গীতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনদর্শন রূপে দেখিয়াছেন। ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দেলনে গীতার ভূমিকা যে অনস্বীকার্য তাহাও এই অর্বাচীনের দল জানে না। আসলে ধর্মনিরপেক্ষতার অন্তরালে ইহারা হিন্দু বিরোধী। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার অছিলা করিয়া ইহারা ভারতের ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করিতে উদ্যোগী হইয়াছে।

এই উচ্ছৃঙ্খল অতি বামপন্থীরা কলিকাতা পুস্তক মেলাকেও কলুষিত করিয়াছে। কলিকাতা পুস্তক মেলা বরাবর মুক্ত চিন্তা এবং মুক্ত মনের সমাহার। বিভিন্ন দর্শনের, বিভিন্ন মতের, বিভিন্ন পন্থের, পুস্তক এই মেলায় বিক্রয় হয়। এতদিন সকলেই মত প্রকাশের এই স্বাধীনতাকে মান্যতা দিয়া আসিয়াছে পুস্তক মেলায়। কেহ কাহারো বিপণীতে গিয়া হামলা করিবার মতো ঘৃণ্য মানসিকতা কখনো প্রদর্শন করে নাই। এই প্রথম অতি বামপন্থীরা তাহাদের মতের অনুসারী নয় বলিয়া একটি বিপণীতে গিয়া হামলা করিল। চেষ্টা করিল ভিন্নমতের কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করিয়া দিবার। অতি বামপন্থীরা যাহাদের ঈশ্বরের আসনে বসাইয়াছেন সেই লেনিন, স্তালিন, মাও, কাস্ত্রোও কোনোদিন গণতন্ত্রে আস্থা রাখেন নাই। গণতন্ত্রে আস্থা ছিল না বলিয়াই বিশ্ব রাজনীতির মানচিত্র হইতে কমিউনিস্টরা ক্রমশ অপস্রিয়মাণ হইতেছেন। যাদবপুর ও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের শৌখিন বিপ্লবীরা ইহা মনে রাখিলে ভালো।

সুভাষিতম্

জলবিন্দুনিপাতেন ক্রমশঃ পূর্যতে ঘটঃ।

স হেতুঃ সর্ববিদ্যানাং ধর্মস্য চ ধনস্য চ।। (হিতোপদেশ)

ধীরে ধীরে পতিত জলবিন্দুতে যেমন ঘট পূর্ণ হয়, সেরকম সমস্ত বিদ্যা, গুণ ও সম্পদ সেভাবেই ধীরে ধীরে অর্জিত হয়।

সিএএ শরণার্থীদের রক্ষাকবচ

ধীরেন দেবনাথ

সম্প্রতি কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার সংসদে পাশ করিয়েছে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। মহামান্য রাষ্ট্রপতি সেই বিলে সই করায় সেটি এখন আইন (সিএএ)। অথচ এদেশের বাম সেকুলারবাদী রাজনৈতিক দলগুলি সাংবিধানিকভাবে পাশ হওয়া আইনটির বিরোধিতায় হয়েছে মুখর। এমনকী, তারা আইনটিকে বাতিলের দাবিতে সর্বোচ্চ আদালতে ঠুকেছে মামলা। আবার কর্মী সমর্থকদের নিয়ে সিএএ বিরোধী বিক্ষোভ আন্দোলনে দাপিয়েছে রাস্তাও, যা আজও অব্যাহত। শাসকদল-সহ সিএএ বিরোধী দলগুলির মদতপুষ্ট 'টুকরে গ্যাং' মার্কা জেহাদিরা ৪-৫ দিন ধরে সারা দেশে বিশেষত এ রাজ্যে দলবদ্ধভাবে চালিয়েছে ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা, ভাঙচুর, মারধর, লুঠতরাজও অগ্নিসংযোগ। তাদের টার্গেট ছিল রেলস্টেশন, যাত্রীবাহী রেলগাড়ি, বাস, লরি, সরকারি সম্পত্তি ইত্যাদি। ছিল রাস্তা অবরোধও। যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল কয়েকশো কোটি টাকা। রাজ্য সরকার ছিল নির্বিকার। কিন্তু কেন?

সত্যি বলতে কী, পূর্ববর্তী মুসলমান তোষণকারী বাম সেকুলারবাদী সরকারগুলি বিগত দশক ধরে হিন্দু শরণার্থী বা উদ্বাস্তুদের শুধু ভোটব্যাঙ্ক করে রেখেছে। কিন্তু নাগরিকত্ব দেয়নি। আর এত বছর পরে উদ্বাস্তুদরদী মোদী সরকার যখন উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দিয়ে ভারতের মূলস্রোতে ফিরিয়ে এনে 'উদ্বাস্তু' পরিচয় ঘুচিয়ে দিতে চাইছে তখন বিরোধীরা তুলেছেন 'গেল গেল' জিগির। কারণ মোদী সরকার উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দিলে তার পুরো কৃতিত্ব পাবে সে। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ উদ্বাস্তুরাও তাদের সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দেবে মোদী তথা বিজেপির দিকে। উদ্বাস্তু ভোট থেকে বঞ্চিত বিরোধীদের কাছে যা হবে রাজনৈতিক পরাজয়ের শামিল। তাই মোদী সরকার যাতে সেই সুবিধা ও কৃতিত্ব না নিতে পারে তার জন্যই তাঁদের এই অনৈতিক সিএএ বিরোধিতা। তাই তাঁরা উদ্বাস্তুদের ভুল বোঝাচ্ছেন এই বলে যে, উদ্বাস্তুরা তো এদেশেরই নাগরিক। কারণ তাঁরা ভোট দেন। তাঁদের আধার, ভোটার, প্যান, রেশনকার্ড ছাড়াও আছে জমি-বাড়ির দলিল, সরকারের দেওয়া জমির পাট্টা, দলিল ইত্যাদি। কিন্তু ওইসব কার্ড, পাট্টা দলিল বা নথিপত্র যে আদৌ নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র নয়, তা প্রমাণ করতেই এই প্রতিবেদনের অবতারণা।

• **আধার কার্ড :** এই কার্ডের তথ্যে আছে, 'আধার পরিচয়ের প্রমাণ, নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়।

• **আইডেনটিটি কার্ড :** এটি ১৮ বছর পূর্ণ হওয়া প্রাপ্তবয়স্ক বা সাবালকত্বের 'পরিচয়পত্র'। সাবালকত্বের সুবাদে এই কার্ড দেখিয়ে ভোট দেওয়া গেলেও এই কার্ডে 'ভোটার কার্ড' বা 'নাগরিকত্ব কার্ড' লেখা নেই। নাবালকরা এই কার্ডের অধিকারী নয়। তাহলে তারা কী এদেশের নাগরিক নয়? যুক্তি কী বলে?

• **প্যান কার্ড :** এই কার্ডটি ব্যাঙ্ক, ট্যাক্স ইত্যাদির আর্থিক হিসেব নিকেশে প্রয়োজন।

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মিথ্যাচার ও অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে প্রত্যেক উদ্বাস্তু ভাইবোন কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া নাগরিকত্বের সঠিক প্রমাণপত্র বিনামূল্যে সংগ্রহ করুন এবং পরিবারের সবাইকে সুরক্ষিত রাখুন।

ঠিকানাহীন এই কার্ডটি নাগরিকত্বের প্রমাণ হতে পারে না। এতে 'নাগরিকত্ব কার্ড' লেখা নেই।

• **রেশন কার্ড :** এই কার্ডটি রেশন দোকান থেকে ন্যায্যমূল্যে ভোগ্যপণ্য সংগ্রহের জন্য। এই কার্ডেও 'নাগরিকত্ব কার্ড' লেখা নেই।

• **জন্ম সার্টিফিকেট :** এটিও নাগরিকত্বের পরিচয় বহন করে না।

• **পাসপোর্ট :** এটি নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র। তবে এটি পেতে হলে পাসপোর্ট অফিসে নাগরিকত্বের প্রমাণ দাখিল করতে হয়। সেক্ষেত্রে উপরিউক্ত কোনো কার্ড বা শংসাপত্রই নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে গ্রাহ্য হয় না। যে কেউ উক্ত অফিসে গিয়ে এর সত্যতা যাচাই করতে পারেন।

তবে নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র একটিই আছে। আর সেটি হচ্ছে— Certificate of Registration (RORM-V)। এর একটি অংশে লেখা আছে— "This is to certify that the person whose particulars are given below has been registered by me as a citizen of India under the provisions of section (5) (1) (a) of the Citizenship Act, 1955." শুধু এই প্রমাণপত্রেই 'Citizen of India' (ভারতের নাগরিক) কথাটির উল্লেখ আছে। তাই প্রত্যেক উদ্বাস্তু ও তার পরিবারের সব সদস্যের জন্য এই প্রমাণপত্রটির প্রয়োজন তবে যারা পরম্পরাগতভাবে অবিভক্ত ভারতের নাগরিক বা ভূমিপুত্র তারা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে জন্মসূত্রে এদেশের নাগরিক। নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

অতঃপর বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মিথ্যাচার ও অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে প্রত্যেক উদ্বাস্তু ভাই-বোন কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া নাগরিকত্বের সঠিক প্রমাণপত্র বিনামূল্যে সংগ্রহ করুন এবং পরিবারের সবাইকে সুরক্ষিত রাখুন। কারণ এটাই হচ্ছে শরণার্থী বা উদ্বাস্তুদের 'রক্ষাকবচ'। মনে রাখতে হবে, আইনসিদ্ধ সিএএ শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দিতে, কেড়ে নিতে নয়। ■

বাইডেনকে পেছনে ফেলে বার্নি স্যান্ডার্স ডেমোক্র্যাট ফ্রন্ট রানার

শিতাংশু গুহ

ওবামার সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট জে বাইডেন এতদিন ডেমক্র্যাটিক শিবিরে ফ্রন্ট রানার ছিলেন। আইওয়া ককাস এবং নিউ হ্যাম্পশায়ার প্রাইমারি শেষ হবার পর ভার্মন্টের সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স এখন ফ্রন্ট রানার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। আইওয়া ককাসে বার্নি দ্বিতীয় হয়েছেন, হ্যাম্পশায়ারে প্রথম। গত ১১ ফেব্রুয়ারি নিউ হ্যাম্পশায়ারে বাইডেন পঞ্চম স্থানে চলে গেছেন। এ মাসে নেভাদা ও সাউথ ক্যারোইলিনায় জয়ী না হলে জো বাইডেন ডেমক্র্যাটিক প্রেসিডেন্ট রেস থেকে ছিটকে পড়তে পারেন।

নিউ হ্যাম্পশায়ারে বার্নি স্যান্ডার্সের পরই আছেন পিট বুটিগেগ, ২৬%-২৪%, দুজনে সমান সংখ্যক ডেলিগেট পেয়েছেন। আইওয়া ককাস ছিল ৩ ফেব্রুয়রি ২০২০। ফলাফল প্রকাশে সেখানে বিঘ্ন ঘটে। যান্ত্রিক সমস্যার কারণে ভোট হাতে গুনতে হয়, ফলে রেজাল্ট বেরুতে অনেক দেরি হয় এবং বিতর্ক সৃষ্টি হয়। চূড়ান্ত ফলাফলে শেষ পর্যন্ত সেখানে পিট বুটিগেগ জয়ী হন; বার্নি স্যান্ডার্স দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। এই বিতর্কের জের ধরে আইওয়া ডেমক্র্যাটিক পার্টি চেয়ারম্যান ট্রয় প্রাইস ১২ ফেব্রুয়ারি পদত্যাগ করেছেন।

নিউ হ্যাম্পশায়ার প্রাইমারির পর ম্যাসাচুসেটসের সাবেক গভর্নর ডেভাল প্যাট্রিক আজ বুধবার ডেমক্রেটিক প্রেসিডেন্সিয়াল রেস থেকে সরে পড়ার ঘোষণা দিয়েছেন। তার আগে ১১ ফেব্রুয়ারি অপর দুই প্রার্থী কলোরাডোর সিনেটর মাইকেল এফ বেনেট এবং ব্যবসায়ী এন্ড্রু ইয়ং প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে যান। এর ফলে ডেমোক্র্যাটিক শিবিরে এখন ৮ জন প্রার্থী আছেন। রিপাবলিকান আইওয়া ককাসে ট্রাম্প ৯৭% ভোট পেয়েছেন। নিউ

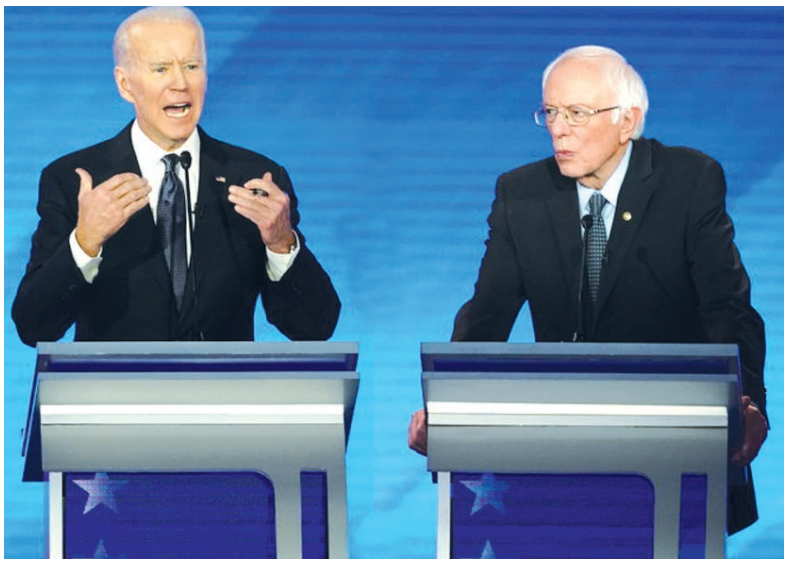

জে বাইডেন (বাঁ দিকে) ও বার্নি স্যান্ডার্স

হ্যাম্পশায়রে তিনি পেয়েছেন ৮৫.৫% ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক ম্যাসাচুসেটস গভর্নর বিল ওয়েল্ড পেয়েছেন ৯.৫% ভোট।

ডেমোক্র্যাটরা ১১ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটন ডিসি-কে স্টেটের মর্যাদা দিয়ে হাউসে একটি বিল পাশ করেছে। সিনেটে এই বিল ফেল করবে তা প্রায় নিশ্চিত। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, সিনেট সংখ্যালঘিষ্ঠ নেতা চাক শ্যুমার এবং হাউস জুডিশিয়ারি কমিটির চেয়ারম্যান কংগ্রেসম্যান জেরি নাডলার প্রাইমারিতে ফেল করবেন। কারণ এঁরা অদক্ষভাবে ইম্পিচমেন্ট প্রক্রিয়াটি হ্যান্ডেল করেছেন। তিনি বলেন, শ্যুমার প্রাইমারিতে নবাগত আলেকজান্ডার অকাসিও কর্টেজের কাছে হারবেন। উল্লেখ্য, এরা সবাই নিউইয়র্কের।

লিবারেল ডেমক্রেট এলান দাড়শোইজ বলেছেন, ডেমক্র্যাটরা হাউস মেজরিটি ধরে রাখতে হলে, স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি ও চাক শ্যুমারকে যেতে হবে। উল্লেখ্য, এলান দাড়শোইজ ইম্পিচমেন্ট ট্রায়ালে ট্রাম্পের অ্যাটর্নি ছিলেন। ট্রাম্প বলেছেন, তার ভাষণের কপি ছিঁড়ে পেলোসি আইন ভঙ্গ করেছেন, কারণ সেটি সরকারি দলিল। আইনজ্ঞরা বলছেন, কোনো আইন ভঙ্গ হয়নি। হোয়াইট হাউস শুক্রবার (৭ ফেব্রুয়ারি) লে: কর্নেল আলেক্সজান্ডার ভিন্ডম্যানকে চাকুরি থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। তিনি ইম্পিচমেন্ট ট্রায়ালে সাক্ষী দিয়েছেন। একইদিন একই কারণে প্রেডিন্টে ইউরোপীয় ইউনিয়নের এম্বাসেডর গর্ডন স্কটল্যান্ডকে বরখাস্ত করেন।

টেক্সাস রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান চিপ রয় ফক্স নিউজকে বলেছেন, আগামী বছর নভেম্বরে রিপাবলিকানরা হাউসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে 'ইম্পিচমেন্ট প্রস্তাব'টি বাতিল করার জন্যে ভোটাভুটি হতে পারে। তিনি বলেন, এতে আইনগত কোনো লাভক্ষতি নেই, কিন্তু ডেমক্র্যাটদের শিক্ষা হওয়া দরকার। ভার্মন্টের রিপাবলিকান গভর্নর ফিল স্কট ৬ ফেব্রুয়ারি বলেছেন, প্রেডিডেন্ট ট্রাম্প ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন, তাকে ক্ষমতায় রাখাটা ঠিক হয়নি। পূর্বাঙেন ট্রাম্প সিনেট বিচারে মুক্ত হয়ে পেলোসি ও ডেমক্র্যাটদের একহাত নিয়েছেন। তাঁর দলের মিট রমনিকেও ছাড় দেননি। ভাষণ ছিঁড়ে সমালোচিত পেলোসি বলেছেন, ট্রাম্প বা রিপাবলিকানদের সঙ্গে আপোশের কোন ইচ্ছে তাঁর নেই। ▮

নির্বাচনী সাফল্য কি বদলে যাওয়া আপকে দীর্ঘমেয়াদি শক্তি জোগাবে?

অতিথি কলম

ইন্দ্রজিত হাজরা ও রাহুল শিবশঙ্কর

এনডিএ শাসনের যাবতীয় দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান ও সমস্ত কর্মকাণ্ডকেই অপছন্দ করা যে বিরোধীরা হাঁসফাঁস করছিলেন, ছোটো কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বের ভারতের রাজধানী শহরে কেজরিওয়ালের জয়ে তাঁরা কিছুটা অক্সিজেন পেলেন। এঁরা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিকল্প হতে পারেন এমন কোনো নেতার সন্ধানে সদা নিমগ্ন। ভোটের প্রচার চলাকালীন সংসদ চ্যানেলগুলিতে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কেজরিওয়ালকে বারবার প্রশ্ন করা হয়েছিল—দিল্লিতে জয় পেলে তাঁর পুরনো সর্বভারতীয় নেতা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা কি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে? যার সম্ভবনা কি থেকে যায় না? এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর এই চতুর রাজনীতিবিদ কায়দা করে

মোকাবিলা করেন। কেজরিওয়ালের উত্তর হ্যাঁ কিংবা না ছিল না। যা তাঁর অধুনা পরিবর্তিত আত্মনিয়ন্ত্রণ ও নিজেকে কিছুটা সংবরণ করে রাখার কৌশলেরই কারণে। মাত্র ৭০ আসনের আইনসভার এই নির্বাচনটি অবশ্যই রাজধানী শহর সংক্রান্ত হওয়ায় আলাদা মাত্রা পেয়েছিল। সেই গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে দিয়ে বিজেপিই কিছুটা যেন মোদীর ও এনডিএ সরকারের ওপর আধা গণভোটের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার মতো প্রচার করে। যার ফলে মনে হতে থাকে দেশের অন্যান্য বহু রাজ্যের সঙ্গে দিল্লি অসঙ্গতিপূর্ণ।

অথচ ভারতের জাতীয় স্তরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমকক্ষ কোনো নেতা নেই। একথাটা বারবার আমাদের স্মরণ করানো হয়। কথাটি যোলাআনা সত্যি। এই পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লির এই ৭০ আসনের নির্বাচন হয়েছে। জায়েন্ট কিলারের স্তরে তুলে নিয়ে গিয়ে কেজরিওয়ালের দলের সারা ভারতে প্রভাব বিস্তার করে তাঁকে ভারত-পরিচালক বানানোর কথা যে কোনো কোনো মহলে উঠছে তা নিতান্তই বাতুলতা শুধু নয় নির্বুদ্ধিতা। 'আপ' প্রকৃতিগতভাবেই একটি আঞ্চলিক স্তরে পরিকল্পনা তৈরি ও তার সফল রূপায়ণে সক্ষম একটি সংস্থা মাত্র। এই বিষয়টা তারা নিশ্চয় বোঝে যার ফলে এই শহরে আধা পঞ্চায়েতি প্রথার পরিচালিত আধা রাজ্যে তারা সফল হচ্ছে। ফাটকা জয় পাওয়া মাত্র এই পরিকল্পনা ও রূপায়ণ পদ্ধতির মডেল দিল্লির চৌহদ্দি ছাড়িয়ে সারা দেশের ওপর প্রয়োগ করার প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ অসার কল্পনা যার বিদেশি নাম ফ্যান্টাসি। কোনো একটা রাজ্যে জয় পেলেই কংগ্রেস সমর্থকরা যেমন সেই সাফল্য রাতারাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে— আজকাল এমন অলীক স্বপ্ন দেখেন এই ভাবনাও হবে সেই ঘরানার। যদিও বাস্তবে সেই কংগ্রেসি কল্পনা অচিরেই বারবার মুখ থুবড়ে পড়ে। তবুও বিজেপি'র দিক থেকে দিল্লিতে আপের কাছে এই পরাজয়ে পর্যালোচনার এক বিচিত্র পরিস্থিতি তৈরি করছে। ভারতবর্ষের মূল শাসনভার দলের থেকে আরও দীর্ঘ সময় থাকায় নিশ্চয়তা থাকলেও ক্রমাগত দেশের নানান রাজ্যে নিয়ন্ত্রণ হারানো পক্ষান্তরে যা নির্বাচকমণ্ডলীর বিশ্বাস হারানোর শামিল তা কালের আত্মবিশ্বাসে টান ধরানোর সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ কঠিন করে তুলবে।

বিজেপির সদ্য সরে আসা সভাপতি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের যে বিরল বৈশিষ্ট্য তা হলো কোনো কিছুকেই ভাগ্যের ওপর ছেড়ে না দেওয়া। একেবারে বুথ স্তর পর্যন্ত সংগঠনকে তত্ত্বধানের মাধ্যমে চাঙ্গা করে দেশ ও দলের সর্ববৃহৎ নেতা নরেন্দ্র মোদীর ভাবমূর্তিকে যথাযথ প্রয়োগ করার মাধ্যমে সাফল্য নিয়ে আসা।

শুধু তাই নয়, পরাজয়ের ক্ষেত্রে নিরীক্ষণ দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়ে ফাঁকগুলি খুঁজে বার করে দ্রুত তা ভরিয়ে ফেলে যাতে হারানো জমি পুরুদ্ধার করা যায় সেই রাস্তা ধরাই বিজেপি'র বরাবরের পদ্ধতি। কিছুদিন ধরে ফাঁকগুলিকে বিন্দুর মাধ্যমে প্রকাশ করে লাইন টেনে চটজলদি বুজিয়ে ফেলে সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে না।

এইসূত্রে দিল্লির জনাদেশ কিন্তু নাগরিক সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে মোটেই নয়। শাহিনবাগে অবস্থান চলাকালীন সরকারের তরফে বিশাল ঘুর পথে পরিবহণ পথ পরিবর্তনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেও নয়। কিন্তু এই ক্ষোভ, অবস্থান নিয়ে যে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা

তৈরি হয়েছে গত দু'মাস ধরে জায়গায় জায়গায় পুলিশের গার্ডরেল দিয়ে নিত্যদিন ব্যারিয়ার তৈরির যে প্রক্রিয়া চলছে পর্যাপ্ত ও সুস্থিতিতে জীবন কাটাতে আগ্রহী দিল্লিবাসীর কাছে তা এক বিসদৃশ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির দৃশ্য তৈরি করছে। এর বিপরীতে কেজরিওয়ালের তুলনামূলকভাবে দিল্লিবাসীর জীবনযাত্রা সহজ ও সুখপ্রদ করতে চটজলদি প্রক্রিয়াগুলি নগরবাসীকে আকৃষ্ট করেছে বেশি। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো গুলি চালিয়ে দেওয়ার প্ররোচনামূলক বক্তব্যের পরও কেজারিওয়াল শাহিনবাগে যাননি। মিডিয়ার লোকজন তাজ্জব বনে গিয়ে লক্ষ্য করেছেন যেখানে কেজরি ব্যাপক হাততালি ও গুণ্ডাগিরি করার হাতেগরম সুযোগ পেয়েছিলেন তাও তিনি কৌশলে পরিহার করেছেন। প্রতিবাদীদের দাবির ভিড়ে মিশে গিয়ে তিনি নিজের 'বিজলি, সড়ক, পানির' স্লোগান থেকে হটেননি। ভারতকে বিচ্ছিন্ন করার ডাক দেওয়াদের সঙ্গে ভিড়লেই তাঁর ফোকাসটা সরিয়ে নেওয়ার অস্ত্র বিজেপি'র হাত শক্ত করত। দেশের তুলনামূলকভাবে বড়ো অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির আঁচ রাজধানী অঞ্চল হওয়ায় না পড়ার কারণে তিনি নির্বাচনের অ্যাজেন্ডাকে নিতান্তই স্থানিক রেখে CAA -এর সমস্যা কেন্দ্রে এই সফল বিভাজন করতে পেরেছিলেন।

কিন্তু ফলাফল বেরোবার পরই তাঁর ঘোষণায় সর্বভারতীয় আকাঙ্ক্ষার ছায়া পড়ে গেল। কেজরিওয়াল তাঁর জয় 'ভারতমাতা' ও 'প্রভু হনুমান'কে উৎসর্গ করলেন। একই সঙ্গে সশক্ত জাতি তৈরি করতে তিনি সকলকে আপ দলে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে রাখলেন। এই জাতি নির্মাণের আহ্বান একেবারেই বিজেপি'র বই থেকে টোকা। এই অবস্থান তাঁর এত দিনের কেন্দ্র বিরোধী বাম অবস্থান থেকে বিপরীত নিতান্তই Centre right অবস্থান। বিজেপি'র অবস্থানের প্রতিরূপ।

দিল্লির নির্বাচনের জয় আগে বলা পরিকল্পনা তৈরি ও রূপায়ণে সাফল্য আনা হিসেবে দেখার যে প্রসঙ্গ আনা হয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে কেজরিওয়ালের পূর্বতন আমলাতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা ও ৫ বছরের সরকার চালানোর প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা কাজ দিয়েছে। তাঁর দলের অনেক মন্ত্রী ও সদস্যেরই সংস্থা চালানোর পেশাগত দক্ষতাও ছিল, যে কারণে তাঁকে বা সদস্যদের কমজোরি টিউব লাইটের সঙ্গে তুলনা করাও ছিল শক্ত। তার সঙ্গে মানুষকে সহজে আকৃষ্ট করার মতো বড়োসড়ো ২০০ ইউনিটের বিজলি ছাড় এবং বিনি পয়সার জলই যে বাজিমাত করেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে শ্রেণী, জাত, ধর্ম সবই মিশে গেছে। জয়ের আঞ্চলিক পরিসংখ্যানগুলি নজর করলেই দেখা যাচ্ছে আপ এই রাজধানী শহরের সমস্ত অঞ্চল জুড়েই সার্বিক জয় পেয়েছে।

২০১৫ সালের আপ ৪৯ লক্ষ ভোট পেয়ে গোটা দিল্লি জয় করেছিল। কিন্তু ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে এই ভোটের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ দল বিজেপি ও কংগ্রেসের কাছে খুইয়ে ফেলে। বিজেপি'র পক্ষে মনে রাখা দরকার, আপ ব্যাপক সংখ্যার এই হিন্দু ভোট আবার নিজের দিকে নিয়ে গেছে।

তবে উল্লেখিত নানান নির্বাচনী কৌশল, বিনামূল্যের বিতরণের মতো আকর্ষণীয় টোপ ব্যতিরেকেও কেজরিওয়াল দলটিকে ইত্যবসরে নতুন করে নির্মাণ করেছেন। এরা এখন আর কোনো সাড়া জাগানো আন্দোলনে লিপ্ত থেকে নিজেদের নৈরাজ্যবাদী প্রমাণ করতে তৎপর নয়। আজকের আপ পুরোদস্তুর রাজনৈতিক মঞ্চ, অন্য দলগুলির থেকে বিন্দুমাত্র আলাদা নয়। বিগত তিন বছরে কেজরিওয়াল ৭ বছর আগে তাঁর দলটির জন্মের সময় অন্য সকলের থেকে আলাদা অনেকটা আকাশ থেকে পড়ার যে দাবি জানিয়েছিলেন সেই সমস্ত বিবাদাত্মক বিষয়গুলির সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণ আপোশ করে নিয়েছেন। ■

"আজকের আপ পুরোদস্তুর রাজনৈতিক মঞ্চ, অন্য দলগুলির থেকে বিন্দুমাত্র আলাদা নয়। বিগত তিন বছরে কেজরিওয়াল ৭ বছর আগে তাঁর দলটির জন্মের সময় অন্য সকলের থেকে আলাদা অনেকটা আকাশ থেকে পড়ার যে দাবি জানিয়েছিলেন সেই সমস্ত বিবাদাত্মক বিষয়গুলির সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণ আপোশ করে নিয়েছেন।"

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই
স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।
টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।
ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name	:	**OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No.	:	**917020084983100**
IFSC Code	:	**UTIB0000005**
Bank Name	:	**AXIS Bank Ltd.**
Branch	:	**Shakespeare Sarani, Kolkata**

রম্যরচনা

ডিজিটাল নেমতন্ন

এক বিয়েবাড়ির প্রীতিভোজে গিয়ে উপহার দেওয়ার পর মোবাইল ফোনে ওটিপি এল। সেটা কাউন্টারে দেখাতে এক প্লেট খাবার পেলাম। বললাম, আমরা দু'জন। সঙ্গে আমার স্ত্রী আছেন। কাউন্টারে বলা হলো, কটা উপহার দিয়েছেন? বললাম, দুজনে মিলে একটা দিয়েছি। কাউন্টারের লোকটি বলল— একটা উপহারে একটা ওটিপি। তাই একটা প্লেট দুজনে ভাগ করে খেয়ে নিন প্লিজ।

* * *

ধাক্কা সই

পল্টুদা ব্যাঙ্কে গেছেন চেক ভাঙাতে।

কাউন্টারে বলা হলো, চেকের পেছনে সই করুন।

পল্টুদা তার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে বললেন দাদা, আমাকে ধাক্কা দিতে থাকুন।

কাউন্টার থেকে থেকে বলা হলো, কী রসিকতা করছেন। তাড়াতাড়ি করুন। লম্বা লাইন দেখছেন না!

পল্টুদা বললেন, ধাক্কা না দিলে সইটা মিলবে না। মূল সইটা চলন্ত বাসে বসে করেছিলাম তো!

উবাচ

"গণতান্ত্রিক দেশে কোনো বিষয়ে মানুষের একমত না হওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার থাকলেও, হিংসার একেবারে স্থান নেই। সিএএ, এনআরসি ও এনপিআর নিয়ে বিরোধীরা দেশজুড়ে যে হিংসার পরিবেশ তৈরি করেছে তা কোনো ভাবেই সমর্থন করা যায় না।"

এম বেঙ্কাইয়া নাইডু
ভারতের উপরাষ্ট্রপতি

কলকাতা নিউটাউনে এক অনুষ্ঠানে

"এমন একটা সরকার গড়তে চাই, যারা জাতি-ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের কথা বলবে। সকলের ভালোর কথা বলবে। আর সেখানে পৌঁছনোই আমার লক্ষ্য।"

অরবিন্দ কেজরিওয়াল
দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য

"শুধুমাত্র আমার মেয়ে নয়, এখনো নির্ভয়ার মতো অত্যাচারের শিকার হচ্ছে ভারতের মেয়েরা। নির্যাতিতারা কখনোসখনো বিচার পেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে যায় অপরাধীরা।"

আশাদেবী
নির্ভয়ার মা

নির্ভয়ার অপরাধীদের তৃতীয়বারের মৃত্যু পরোয়ানা জারির পর প্রতিক্রিয়ায়

"গান্ধীজীর স্বপ্ন সাকার করতে দেশজুড়ে নিষিদ্ধ হোক মদ। শুধুমাত্র বিহার বা আশেপাশের রাজ্যে হলে হবে না। গোটা দেশেই করতে হবে। এটা গান্ধীজীর ইচ্ছা ছিল।"

নীতীশ কুমার
বিহারের মুখ্যমন্ত্রী

দিল্লিতে 'লিকার ফ্রি' আলোচনা সভায়

কমিউনিস্টদের হাতে পেনসিল ছাড়া আর কিছুই রইল না

সুজিত রায়

শৃঙ্খল ছাড়া যাদের হারাবার কিছু নেই, তারাই কমিউনিস্ট। কমিউনিস্ট তথা বামপন্থীদের সংজ্ঞা নির্ধারণে এটাই ছিল প্রচলিত ধারণা। খাটো পাজামা, লম্বা ঝুল সুতির পাঞ্জাবি, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ, পায়ে যেমন তেমন একটা চটি। এটাই ছিল কমিউনিস্টদের সার্বজনীন পোশাক। তা সে সোভিয়েতপন্থী, রাশিয়াপন্থী কিংবা চীনপন্থী যেমনই হোক না কেন। লেনিন, স্তালিন কিংবা মাও-জে-দং যাঁকেই তারা অভিভাবকত্বের শিরোপা দিয়ে থাকুন না কেন সবার পিঠে ছাপ ছিল একটাই—সর্বহারা। আর সেই পরিচয়েই এদের মানুষ দেখেছে খাদ্য আন্দোলনে, বর্গা আন্দোলনে, জোতদার-জমিদার-মহাজন প্রতিরোধ আন্দোলনে। এদের মানুষ দেখেছে একই পরিচয়ে মন্ত্রীর তখতে, বিধানসভা, লোকসভার বিতর্কের মঞ্চে। ওই সর্বহারাদেরই দেখেছি নকশালবাড়িতে, ওড়িশায়, অন্ধ্রপ্রদেশে। দেখেছি অন্য রূপে মুখোশের আড়ালে জঙ্গল মহলে, সিঙ্গুরে, নন্দীগ্রামে, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়ার জঙ্গল মহলে।

হ্যাঁ সত্যিই ওই সর্বহারাদেরই আবার দেখেছি কর্পোরেটের বড়োকর্তা হয়ে পুঁজিপতি দখলদারদের পায়ে তেল মাখাতে। ওই সর্বহারাদেরই দেখেছি খবরের কাগজের সম্পাদক হয়ে লাল থেকে সবুজ রঙের পরিণত গিরগিটি হতে। ওই সর্বহারাদেরই দেখেছি তৃণমূলি হয়ে নেত্রীর সুরে সুর মিলিয়ে ক্যা-ক্যা ছিঃ-ছিঃ করে রাজপথে চিলচিৎকার করতে। আবার ওই সর্বহারাদেরই দেখেছি সগর্বে ঘোষণা করতে—মাননীয়ার চেয়ে বড় কমিউনিস্ট আর কে আছে?

এবার দেখলাম এক নয়া রূপধারী সর্বহারা থুড়ি কমিউনিস্টদের। গোটা পৃথিবীতেই দাস ক্যাপিটাল যখন প্রায় নিষিদ্ধ হয়ে গেছে, যখন ভারতবর্ষের কমিউনিস্টরা স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তমার্গকে আঁকড়ে ধরে ডুবসাঁতার না জানা শিশুর মতো খাবি খাচ্ছে—তখনই এই নব্য কমিউনিস্টদের দেখা মিলল এবারের বইমেলায়। এদের মুখে স্লোগান—আজাদি (যা এতদিন ধরে কাশ্মীরের পাকপন্থীরা বলে এসেছে)। ধুলো মাখা পা পবিত্র গীতার ওপর। শৃঙ্খল ছাড়া যাদের হারাবার কিছু নেই, তাদের এ এক নবরূপ পরিগ্রহ—আধুনিক রাজনীতির অবতার স্বরূপ।

না, ঘাবড়াবার কিছু নেই। ভয় পাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ কমিউনিস্টদের স্বরূপ এটাই। এরা কোনোদিনই ভারতবর্ষ তথা ভারতবাসীর মঙ্গল চায়নি। এরা কোনোদিন নিজে বাবাকে বাবা বলেনি। অন্যের বাপকে বাপ বলে পরিচয় দিয়ে এসেছে। এরা কোনদিনই চায়নি ভারতবর্ষ একটি অখণ্ড শক্তিশালী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করুক। এদের কাছে রোলমডেল ছিল পূর্ব ইউরোপ। তাই পূর্ব জার্মানি, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া, বুলগেরিয়ায় পিঁপড়ের মৃত্যুতেও এরা শোকমিছিল বের করে কলকাতায়, কেরালায়, দিল্লিতে। অথচ খোদ নয়াদিল্লির বুকে হাজারো নির্ভয়া ধর্ষিতা হলেও এদের বুক ফাটে না। চোখে জল আসে না। আজ দেখেছেন, ওরা দাঁড়িয়ে মহান পবিত্র গীতার ওপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আগামীকাল দেখবেন ওরা পা তুলেছে মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারতের ওপরও। কিন্তু কোরানে? নৈব নৈব চ। কারণ এখন এই মুহূর্তে যখন গোটা ভারতবর্ষে চালু হয়ে গেছে নাগরিকত্ব আইন, তখন এই কমিউনিস্টদের পরম মিত্র পাকিস্তান। কারণ পাকিস্তান গড়তে জানে না, ভাঙতে জানে। ইসলাম রক্তদান করতে শেখায় না, রক্ত ঝরাতে জানে। কমিউনিস্টরা তো এটা চায়। ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করে দিক বিদেশি শক্তি। তাহলে তথাকথিত বিশ্বের টুকরো টুকরো বামপন্থী দেশগুলিকে রেড কার্পেট পেতে অভ্যর্থনা জানাতে সুবিধা হবে মহম্মদ সেলিম, সীতারাম ইয়েচুরিদের। ভুললে চলবে না, ভারতবর্ষের কমিউনিস্টরাই কিন্তু স্বাধীনতার আগে মুসলিম লিগের পাকিস্তানের দাবিকে সর্বশক্তি নিয়ে সমর্থন করেছিল। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট কলকাতায় মনুমেন্টের নীচে মুসলিম লিগের সভায় আলো করে বিরাজ করেছিলেন সর্বহারা কমরেড জ্যোতি বসু। সেই সভা থেকেই ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ডাক দিয়েছিলেন শয়তান সোরওয়াবর্দি সরাসরি হিন্দুদের বিরুদ্ধে এবং গোটা কলকাতা শহর ভেসে গিয়েছিল হিন্দুর রক্তে। হিন্দুর লাশের পাহাড় পাহারা দিত শুধু শকুনেরা।

কাশ্মীরের পণ্ডিত পরিবারের মেয়েদের ধর্ষণ করলে কমিউনিস্টরা পথে নামে না। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী আফজল গুরুর ফাঁসি হলে এরা পথে নামতে বিন্দুমাত্র সময় নেয় না। তাহলে এরা গীতার ওপর পা তুলে দাঁড়ালে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

ভুললে চলবে না, এই কলকাতা শহরেই জন্ম নিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি অব পাকিস্তান। মদত ছিল এ রাজ্যের কমরেডদের। কিন্তু পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি শিকড় গাড়তে পারেনি। বরং রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির কৃষক আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্রের ওপর রাজশাহি ও নবাবগঞ্জের জেলে মুসলিম লিগ যে অত্যাচার করেছিল তার নজির আর দ্বিতীয়বার সৃষ্টি হয়নি ভারতবর্ষের বুকে। কিন্তু ওই যে বলে, বিশ্বের বৃহত্তম বিশ্বাসঘাতক হলেন

কমিউনিস্টরা। তাই ইলা মিত্রের ওপর মুসলমানদের নির্মম অত্যাচারের পরেও বামপন্থীরা চিরকাল ইসলামি মৌলবাদকেই সমর্থন জানিয়ে এসেছেন। পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরের অপশাসনে এই কমিউনিস্টরাই সবচেয়ে বেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকিয়েছেন ভোটব্যাঙ্ক গড়ার জন্য। এই বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড তুলে দিয়েছে এই কমিউনিস্টরাই। আজ যখন কেন্দ্রে বিজেপি সরকার নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করে নাগরিকত্ব ইস্যুতে ছড়িয়ে থাকা হাজারো জটিল সমস্যার সমাধান করতে যাচ্ছে তখন এই সর্বহারার দলই কলকাতায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের খেপিয়ে তুলে 'আজাদি'র স্লোগান দেওয়াচ্ছেন। দিল্লির জেএনইউ-এর ছাত্র-ছাত্রীদের, জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ভুল বুঝিয়ে হিংসাশ্রয়ী আন্দোলনে নামাচ্ছেন। কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দান আর দিল্লির শাহিনবাগে অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে থাকা গরিব মুসলমান সম্প্রদায়ের মা-বোনেদের দিনের পর দিন বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করে বসে থাকতে সাহস জোগাচ্ছে। উদ্দেশ্য তো একটাই, ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের শিকড়ে আঘাত হানা, যাতে দেশ টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তাতে বামপন্থীদেরই সুবিধা। বিভিন্ন রাজ্যে এলাকা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন চলবে। যেমনটি কমিউনিস্ট নেতারা ভেবেছিলেন ১৯৪৩ সালে স্তালিন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশালালের অস্তিত্ব ধুরে মুছে সাফ করে ফেলার পর। ভারতবর্ষের সর্বহারার নেতৃবৃন্দ বাসবপুন্নাইয়া, রাজেশ্বর রাও, সুন্দরাইয়া, হনুমন্ত রাও, চন্দ্রশেখর রাও-রা সেদিন যেমন ভেবেছিলেন, আজকের কমিউনিস্ট নেতারাও একইরকম ভাবছেন। রাশিয়া না আসুক চীনই দখল নিক ভারতবর্ষের—যদি তা হয় পাকিস্তানের মদতে তো হোক। কিন্তু ভারতবর্ষকে এক থাকতে দেওয়া যাবে না।

গীতার ওপর পা এরা ছাড়া কারা তুলবে? রামায়ণ-মহাভারতকে এরা ছাড়া কারা ছুঁড়ে ফেলবে? বেদ উপনিষদকে এরা ছাড়া কারা যৌন সাহিত্য হিসেবে বদনাম দেবে? এরা ছাড়া কারা কথায় কথায় কোরান হাদিশের প্রসঙ্গ তুলবে? এরা ছাড়া কারা অফিস করবে মিনি পাকিস্তান আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে? যৌক্তিকতায় বিশ্বাসী মানুষজন একটু ভেবে দেখবেন—ভারতবর্ষ এক সনাতন ঐতিহ্যের পরম্পরাবাহী দেশ। ভারতবর্ষ সেই দেশ যেখান থেকে উদ্গত হয়েছিল সভ্যতার প্রথম বাণী অসতো মা সদ্গময়/তমসো মা জ্যোর্তিগময়। ভারতবর্ষ সরস্বতী সভ্যতার বাহক। সিন্ধু সভ্যতার ঐতিহ্যবাহী দেশ। এদেশের মানুষ হিন্দু কোনও একক ধর্মাচরণে বিশ্বাসী নয়। সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথাই বলা হয় হিন্দুধর্মে। সেই হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান জীবনবেদ হলো গীতা। সর্বহারারা জানেন, গীতাকে ধ্বংস করতে পারলে হিন্দুত্বও বিনাশ হয়ে যাবে।

তাই কলকাতা বইমেলায় যখন খ্রিস্টানরা অবাধে বিতরণ করেন বাইবেল, যখন মুসলমানরা অবাধে বিতরণ করেন কোরান, হাদিশ, তখন হিন্দুরা হনুমান চালিশা বিতরণ করলে সবার আগে আক্রমণ করে কমিউনিস্টরা। কারণ এরা জানে, ভারতবর্ষের ৮০ শতাংশ হিন্দুকে ভয় দেখানো বেশি দরকার। এরা একত্রিত থাকলে দেশও একত্রিত থাকবে। তাই ২০ কোটি মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে অত্যাচারের নতুন জমানা তৈরি কর। সে জমানার প্রমাণ পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা ভারতবর্ষে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় মুসলমানদের ভয়াবহ হিংস্রতার প্রকাশ। সে জমানার প্রমাণ শাহিনবাগ। সে জমানার প্রমাণ জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে মুসলমান ছাত্রদের লেলিয়ে দেওয়া হয় রাজ্যপালের বিরুদ্ধেও।

কাশ্মীরের শেখ আবদুল্লা যে বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা ছিলেন তাতে কারও দ্বিমত থাকার কথা নয়। তাঁরই প্রত্যক্ষ মদতে ১৯৪২ সালে শ্রীনগরে গঠিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির কাশ্মীর শাখা। ১৯৪৬ সালের কমিউনিস্টরা সরাসরি কাশ্মীরের পাকপন্থী আন্দোলনকে সমর্থন দেয়। তখন শেখ আবদুল্লার ন্যাশনাল কনফারেন্সে ঝাঁকে ঝাঁকে সদস্যপদ নিয়েছেন কমিউনিস্টরাই। শেখ আবদুল্লার সরকারেও যোগ দিলেন একঝাঁক কমিউনিস্ট। শেখ আবদুল্লার প্রধান উপদেষ্টা তিনিও কমিউনিস্ট বি পি এল বেদি। এদেরই মদতে ১৯৪৮ সালে কাশ্মীরের মাটিতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল। আর কাশ্মীরের উপমুখ্যমন্ত্রী বক্সি গোলাম মহম্মদ তো প্রকাশ্যেই স্বীকার করতেন, তিনি কমিউনিস্ট। স্বাধীন কাশ্মীরের প্রধান পৃষ্ঠপোষকও তো ছিলেন তিনিই।

তাহলে কমিউনিস্টদের বরাবরই নজর এলাকাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের ওপর। নকশালবাড়ি আন্দোলনও তো প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল এলাকাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন— যেটিকে চীন বলেছিল—'ভারতের আকাশে বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ'। বড়ো উল্লাসিত হয়েছিলেন সর্বহারা চাটুকাররা। তাই তো নিঃসঙ্কোচে কলকাতার দেওয়াল জুড়ে লেখা হয়েছিল—'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান'। আজও সেই লালসা বিদ্যমান। কারণ ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করতে চাওয়া প্রায় সব শক্তিকেই মদত জুগিয়েছে সর্বহারারা চিরকাল আর স্লোগান তুলেছে—'শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই।'

থাকবেটা কী? আজন্ম কমিউনিস্টরা দেশকে কী দিয়েছে? অবিশ্বাস, বঞ্চনা, হিংসা, বিশ্বাসঘাতকতা, লোভ, রিরংসা, কৃত্রিমতা আর মিথ্যাচারিতা। তার পরিণতিতে তো পাবে শৃঙ্খলই। আর কী চাও? মনে পড়ে, এই সেদিন ১৯৭১-এও তোমরা সর্বহারারাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভেস্তে দিতে হাত মিলিয়েছিলে রাজাকারদের সঙ্গে। এই কলকাতাতেই তো জন্ম নিয়েছিল বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী)।

মনে রাখবেন, কাশ্মীরের পণ্ডিত পরিবারের মেয়েদের ধর্ষণ করলে কমিউনিস্টরা পথে নামে না। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী আফজল গুরুর ফাঁসি হলে এরা পথে নামতে বিন্দুমাত্র সময় নেয় না। তাহলে এরা গীতার ওপর পা তুলে দাঁড়ালে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

স্বাধীনতার আগে থেকেই কমিউনিস্টরা এইভাবেই নোংরা রাজনীতি করে এসেছে। কিন্তু শিকড় ছড়াতে পারেনি। এবারে তারা গীতা পা দিয়ে মাড়িয়েছেন। স্বপ্ন দেখেছেন 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে, ইনসাল্লা ইনসাল্লা। কিন্তু এবারও শিকড় ছড়ানো গেল না। তার আগেই বইমেলা শেষ হলো। শাহিনবাগও।

কমিউনিস্টদের হাতে পেনসিল ছাড়া আর কিছুই বোধহয় রইল না। ■

ভারতের বুদ্ধিজীবীরা বিপুল গরিষ্ঠাংশের মতামতকে অগ্রাহ্য করে থাকেন

ধনঞ্জয় মহাপাত্র

বাক্‌স্বাধীনতা, ভিন্ন মত পোষণ, সহিষ্ণুতা ও সকলকে সঙ্গী করে চলাই গণতন্ত্রের মূল মন্ত্র। এই সূত্রে বৈচিত্র্যের মধ্যে একতাই গণতন্ত্রের জীবনীশক্তি বলে চিহ্নিত। এটিই একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে প্রাণবন্ত করে রাখে। সকলেই জানেন গণতন্ত্র নাগরিকদেরই হিতার্থে, তাদেরই দ্বারা ও তাদেরই জন্য সৃষ্ট। তবে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তই কিন্তু গরিষ্ঠাংশের মতানুসারে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

পঞ্চায়েত থেকে সংসদ অবধি একজন নাগরিক প্রতিনিধি সকলের মধ্যে সর্বাধিক ভোট পেয়েই নির্বাচিত হয়ে থাকেন। কোনো একটি রাজনৈতিক দল বা কয়েকটি দলের জোট একত্রিত হয়ে আইনসভায় নির্বাচিত সদস্যদের গরিষ্ঠাংশের সমর্থন পেলে তবেই সরকার গঠন করতে পারে। আইন প্রণয়ণের ক্ষেত্রে সদস্যদের গরিষ্ঠাংশ যদি প্রস্তাবিত আইনের ক্ষেত্রে অনুমোদন দেয় তখনই কেবল সেটি আইনে রূপান্তরিত হতে পারে। যে কোনো অকিঞ্চিৎকর বা জরুরি বা দেশের সংবিধান সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো মামলা সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের কাছে এসে পৌঁছলে বিচারকদের সংখ্যাধিক্যের রায়ের ভিত্তিতেই মামলাটির নিষ্পত্তি হয়।

উল্লেখিত সকল ক্ষেত্রগুলিতেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার ক্ষেত্রে সংখ্যার বিপুলত্ব বা অল্প ব্যবধানের গরিষ্ঠতায় গৃহীত সিদ্ধান্তের মান্যতা আইন হিসেবে বা সরকারি ভাবে তার গ্রহণযোগ্যতায় কোনো হেরফের ঘটায় না। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে চরিত্রগতভাবে বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করতে অভ্যস্ত বুদ্ধিজীবীদের অংশবিশেষের প্ররোচনায় দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের দৃষ্টিভঙ্গিকে খাটো করে দেখবার বা তাকে বাতিল করার প্রচেষ্টা চলে আসছে। নিশ্চয়ই বাক্‌স্বাধীনতা একটি মৌলিক অধিকার। কিন্তু তার মানে কি এই দাঁড়ায় যে কোনো মতের বিরুদ্ধাচরণকারীদের মতটিই মৌলিকভাবে (অবিসংবাদিতভাবে) ঠিক? অতীতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে নেতৃত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশে একটি গণতান্ত্রিক ধাঁচা প্রতিষ্ঠা করারও চেষ্টা করেছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তারা ভারত সম্পর্কে একটি বিশ্বজনীন পরিচিতি নির্মাণ ও বহুবিধ মতামতের একত্রীকরণ— এই উভয়ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছিল। এরই পরিণতিতে দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়। বিভাজনের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী খুন হন এবং আততায়ীর গুলিতে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু হয়।

১৯৩৮ সালে সুভাষ চন্দ্র বোস কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হন। স্বাধীনতা সংগ্রামকে বেগবান করে তুলতে তিনি জাতীয়তাবাদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি দুটি অ্যাজেন্ডাকে সামনে রেখে পুনর্নির্বাচনে লড়েন। একটি হলো বিদেশি প্রভুর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সংগ্রাম এবং দ্বিতীয়টি ছিল কংগ্রেসের অন্দরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত নেতা— যাঁরা এই আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন তাদের আপোশপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করা। মহাত্মা গান্ধী-সহ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একটা বড়ো অংশ পট্টভি সীতারামাইয়াকে সভাপতি করার পক্ষে তাঁদের সমর্থন দেন। কিন্তু সামগ্রিক

গরিষ্ঠাংশতার ভিত্তিতে সুভাষচন্দ্র জয়ী হন।

সকলে জানেন গান্ধী ঘোষণা করেছিলেন, সীতারামাইয়ার পরাজয় তাঁর ব্যক্তিগত পরাজয়। এরই পরিণতিতে দলের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। অত্যন্ত কটু সমালোচনা সহ্য করতেনা পেরে সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করেন। সংখ্যালঘুর মতামত অবলীলায় সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তকে পদদলিত করে। ভারতীয় গণতন্ত্রে সেই এক নতুন ঘরানার প্রতিষ্ঠা হলো। শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেই হবে না আসল ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকবে যারা ক্ষমতার অলিন্দের অন্তরালে থেকে নিজেদের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে চান তাঁদের হাতে।

এই তত্ত্বটিকে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে হাতে কলমে প্রয়োগ করে দেখান গান্ধী ও কংগ্রেস দল। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাস বরাবরই গান্ধীজী মনস্থির করে ফেলেন জওহরলালই প্রধানমন্ত্রী হবেন। কিন্তু কংগ্রেসের ১৫টি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মধ্যে ১২টির সদস্যরাই বিপুলভাবে সর্দার প্যাটেলকে প্রধানমন্ত্রী করার পক্ষে মত দেন। হ্যাঁ, প্যাটেলের পক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু নেহরুর সঙ্গে ছিলেন গান্ধীজী স্বয়ং। হায়! আমরা তো জানি কে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। সেদিনই ভারতীয় রাজনীতিতে গরিষ্ঠাংশের মতামতের গ্রহণযোগ্যতা চিরকালের মতো কবরস্থ হয়ে গেল। পরবর্তীতে দেখুন সংবিধান তৈরির সময়কাল। অভিন্ন দেওয়ানিবিধি (Uniform Civil Code) নিয়ে তীব্র বাদানুবাদ সৃষ্টি হয়। এবারও গরিষ্ঠাংশ চাইছিলেন ইউসিসি লাগু হোক। মুসলমান নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে বিহারের নেতা হুসেন ইমাম আদাজল খেয়ে এর বিরুদ্ধাচরণ করেন। পক্ষান্তরে বি আর আম্বেদকর শরিয়তি আইন যে শতাব্দীর পর শতাব্দী দেশ জুড়ে বলবৎ থেকে এক অপরিবর্তনীয়তা অর্জন করেছে ইমামদের এ যুক্তি নস্যাৎ করে দিলেও সংখ্যালঘু মতের কাছে তাঁকে নতি স্বীকার করতে হয়। ইউসিসি বরাবরের জন্য ৪৪ নং ধারাভুক্ত হয়ে সংবিধানের directive principle-এর আওতাধীন হয়ে যায়। আরও একবার গরিষ্ঠাংশের মতামত পরাজিত হয়। কত বলা

যায়! ১৯৫৫-৫৬ সালে সংসদে হিন্দু কোড বিল গৃহীত হয়। এই সময় সদস্যদের বিপুল সংখ্যক চাইছিলেন একই সঙ্গে মুসলমান ব্যক্তিগত আইনে (personal law)-এ পরিবর্তন এনে একই ধরনের কোড প্রণয়ন করা হোক। মুসলমানরা এর বিরোধিতা করল। প্রধানমন্ত্রী নেহরু বলছিলেন মুসলমান সম্প্রদায় এখনও ব্যক্তিগত আইনের পরিবর্তন গ্রহণ করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত নয়।

এর পর থেকে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করা পক্ষে দাবি তীব্রতর হতে থাকে। লক্ষণীয় হলো ১৯৮৫ সালে শাহবানো মামলার শুনানির সময় সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছিল— ''A Common Civil Code will help the cause of national integration by removing disparate loyalties to law (আইনের প্রতি বৈষম্যমূলক আনুগত্য) Which have conflicting ideologies'' ১৯৯৫ সালে সারিয়া মুদগল মামলায় আরও এক ধাপ এগিয়ে সর্বোচ্চ আদালত জানায় ''যখন দেশের ৮০ শতাংশ নাগরিক নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত আইনের শর্তাধীন হয়ে গেছে সেখানে দেশ জুড়ে ইউসিসি লাগু করার সিদ্ধান্তকে এখনও ঝুলিয়ে রাখার কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না।''

এতগুলি ঘটনার উল্লেখ এটাই প্রমাণ করে আমাদের দেশে যথার্থ গণতন্ত্রকে দুর্বল করার রসদ মজুত করতে কোনো কসুর করা হয়নি। এর ফলে গরিষ্ঠাংশের অভিমতের বারবার কণ্ঠরোধ করে সংখ্যালঘুর ইচ্ছেকে গৌরবান্বিত শুধু নয় তাকে আইনি বৈধতা দেওয়ারও সবরকম চেষ্টা হয়ে এসেছে। বাস্তবে যদি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বা ক্রিয়াকলাপ এই অতি অকিঞ্চিৎকর সংখ্যাক বুদ্ধিজীবীর মতামতের সঙ্গে না মেলে সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু মুহূর্তে আপনাকে হুমকি দেবে। তাদের বক্তব্য 'you know who I am'। এই ধরনের একটি নাটকীয় ঘটনা চাক্ষুষ করল দিল্লি পুলিশ। দিল্লির এক সমাজকর্মী তথা বিখ্যাত উকিল ও একজন পূর্বতন সংখ্যাতত্ত্ববিদ ও রাজনৈতিক দল পরিচালকের শিকার হলেন তারা। এই দুজন সিএএ বিরোধী ধরনা অঞ্চলে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের উত্তেজনার আশঙ্কায় ন্যায়সঙ্গত ভাবে বাধা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ওই আইনজ্ঞ তাঁর এক সঙ্গীকে এই ঘটনার ভিডিয়ো তোলার নির্দেশ দেন বিশেষ করে যাতে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মীটিকে চিহ্নিত করা যায়। এর পরই তিনি হুংকার দিয়ে বলেন, ''জানো আমি কে? আমি একজন মহামান্য। আমি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের আইনজীবী। এখনই এই মামলা সর্বোচ্চ আদালতে তুলব। ভালো চাও তো তুমি ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে চেষ্টা কর।'' আচ্ছা, সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতিদের তিনি স্বপক্ষে কী যুক্তি দেবেন যদি তাঁরা তাঁর মামলাটির গ্রহণযোগ্যতাকেই অস্বীকার করেন অর্থাৎ মামলটি না নেন?

(লেখক বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী ও আইনজ্ঞ)

অনুবাদ : সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

পুলিশ প্রমাণ করল তারা হিন্দুবিদ্বেষী

মণীন্দ্রনাথ সাহা

যেকোনো রাজ্য বা দেশে যদি পুলিশ, প্রশাসন এবং সরকার নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন না করে তাহলে সেই রাজ্য বা দেশের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হয়। সম্প্রতি কলকাতা বইমেলার শেষ দিনে পুলিশ সেই কাজটি করে বুঝিয়ে দিল এরাজ্যে হিন্দুদের গণতান্ত্রিক অধিকার বলে কিছু নেই। যা আছে তা শুধুই তোষণ।

গ্রন্থাগার নিয়ে কবিগুরু মন্তব্য করেছিলেন যে—"এখানে দীর্ঘপ্রাণ ও স্বল্পপ্রাণ পরম ধৈর্য ও শান্তির সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিতেছে না।" সেই রকম গ্রন্থমেলায় যাঁরা আসেন, গ্রন্থ কেনেন, পড়েন এবং উপহার দেন তাঁদের মনে আনন্দের অনুভূতি ও প্রশান্তি আসা স্বাভাবিক। সেখানে কেউ কাউকে উপেক্ষা করেন না। এরকম একটা মানব সংস্কৃতির পীঠস্থানে পুলিশ যখন কারো অঙ্গুলি হেলনে গ্রন্থ বিতরণে শুধুমাত্র হিন্দুদের বাধা দেয় তখন আশঙ্কা হয় রাজ্যের সংস্কৃতির ধ্বংসসাধনে আর বিলম্ব নেই। খবরে প্রকাশ, গত ৮ ফেব্রুয়ারি শনিবার কলকাতার বইমেলার শেষদিনে ধর্মনিরপেক্ষ দেশে সংস্কৃতির পীঠস্থান পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা বইমেলায় হনুমান চালিশা বিতরণে বাধা দিয়েছে পুলিশ। আর সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বইমেলার শেষ দিনে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেছে। এদিন বিকেলের পর থেকে বিশ্বহিন্দু পরিষদের স্টল থেকে বইমেলায় আগত সকলকে হনুমান চালিশা বিলি করা হচ্ছিল। পুলিশ তাতে বাধা দেয়। কেন হনুমান চালিশা বিলিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে, সেই প্রশ্ন তুলে পুলিশের সঙ্গে প্রথমে বচসা এবং পরে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন মেলায় আগত হিন্দুত্বপ্রেমী মানুষরা। অথচ এই মেলাতেই অন্য স্টল থেকে সম্প্রদায় বিশেষে বাইবেল ও কোরান বিতরণ করা হয়েছে। তাতে পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো রকম বাধা দিতে দেখা যায়নি।

আমার মনে হয়, পুলিশ ভালো কাজই করেছে। কেননা এরাজ্যে হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধ নয়। তাই পুলিশ সেই সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াতে মদত জুগিয়েছে মাত্র। ভারতের অন্য কোনো রাজ্যের পুলিশ পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের মতো এতবড়ো বিপ্লব দেখাতে পারেনি। ইতিপূর্বে আমরা পুলিশের বহু বিপ্লবী কর্ম দেখে অভ্যস্ত হয়েছি। যেমন—হাওড়ার তেহট্ট হাইস্কুলে সরস্বতী পূজার দাবি জানাতে গেলে পুলিশ বীরত্ব প্রকাশ করে প্রিয়া বাগ নামে এক কিশোরী ছাত্রীর মাথা ফাটিয়ে রক্ত ঝরিয়েছিল। এরাজ্যে মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের নামে কেউ জয়ধ্বনি দিলে পুলিশ তাকে জেলে পুরে দেয়। বাঙ্গালি হিন্দুর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজার বিসর্জন

পুলিশ আটকে দেয়। সরস্বতী পূজা ও অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব পালনের জন্য পুলিশ অনুমতি দেয় না। আদালত থেকে সেই অনুমতি নিয়ে আসতে হয়। কাজেই এহেন বীরপুঙ্গব পুলিশ যে হনুমান চালিশা বিতরণে বাধা দেবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কোনো কারণ নেই। পক্ষান্তরে পুলিশের বিপ্লবীয়ানা কোন্ কোন্ স্থানে নেতিয়ে পড়ে সেগুলিও একটু দেখে নেওয়া যাক। যেমন—২০১৩ সালে হেরোভাগ, নলিয়াখালি, গোপালপুর, গলাডহরা প্রভৃতি গ্রামে হাজার হাজার হিন্দুদের ঘরছাড়া করছিল প্রশাসনের অত্যন্ত প্রিয় সম্প্রদায়ের লোকেরা। অথচ পুলিশ সেসময় হামলাকারীদের বিরুদ্ধে বীরত্ব দেখাতে পারেনি।

২০১৫ সালে উস্থি, মন্দিরবাজার, ডায়মন্ডহারবার প্রভৃতি থানার প্রশাসনের কাছের এবং প্রিয় লোকেরা হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করে হিন্দুদের ঘরবাড়ি, মন্দির প্রভৃতিতে ধ্বংসলীলা চালানোর সময় সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন খোদ রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী গিয়াসুদ্দিন মোল্লা। তখনও পুলিশ তাদের কাজে বাধা দেয়নি, কারণ তাহলে ওরা পুলিশের কোমর ভেঙে দেবে এবং পুলিশ এদের কাছ থেকে যে মাসোহারা পায় তা বন্ধ হতে পারে সেই ভয়ে। ২০১৫ সালে নদীয়ার কালিগঞ্জ ব্লকে চারজনকে হত্যা করা হয়। নদীয়ার জুরানপুর গ্রামে হিন্দুদের শোভাযাত্রায় মুসলমানদের পরিকল্পিত হামলার সময়ে পুলিশ নীরব দর্শক সেজে ছিল।

২০১৬ সালে মালদা জেলার কালিয়াচকে হিন্দুদের দেবস্থান অপবিত্র করা, ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া এবং শেষে খোদ পুলিশ থানা আক্রমণ করে থানার বাড়ি, গাড়ি, নথি পোড়ানো এবং পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্র পর্যন্ত লুঠ করেছিল শাসকদলের আদরের ভাইয়েরা। সেদিন পুলিশ বীরদর্পে পশ্চাদপসরণ করে প্রাণ বাঁচিয়েছিল। আবার কখনও কখনও দেখা গেছে মারের ভয়ে পুলিশ টেবিলের নীচে বা আলমারির পাশে লুকিয়ে পড়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে দেশি-বিদেশি সন্ত্রাসবাদী, পুলিশ-প্রশাসন এবং সরকার একজোট হয়ে হিন্দুবিদ্বেষী কাজে জান-প্রাণ দিয়ে লড়তে নেমেছে। সুতরাং বইমেলায় যা ঘটেছে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। ■

চৈতন্যের সন্ধানে বিজ্ঞান

গিরিজাশঙ্কর দাশ

শ্রীশ্রী চণ্ডীতে দেবী নারায়ণীর স্তুতি করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যাভিধীয়তে। নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমো নমঃ।' যে দেবী সর্বভূতে চৈতন্য বলে অভিহিত, তাঁকে বারবার প্রণাম। তন্ত্রে যাঁকে চৈতন্যময়ী বলা হয়েছে, বেদে তাঁকে বলা হয়েছে, ওঁ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। সৎ চিৎ ও আনন্দ। বৈষ্ণবেরা তাঁকেই বলে ওঁ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ। শ্রীমতী রাধিকা তাঁর চিৎ শক্তি। এই চৈতন্যকে সর্বভূতে দর্শন করেছেন, সর্বকালের সাধক, মুনি-ঋষি, যোগী-মহাপুরুষরা। আধুনিককালে যে অবতার বরিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন, সেই পরমপুরুষ শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও দিব্যভাবে সর্বত্র চৈতন্য দর্শন করেছেন। আবার ১লা জানুয়ারি ১৮৮৬ সালে রুগণ শরীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি গৃহী ভক্তদের আশীর্বাদ করেছিলেন, 'তোমাদের চৈতন্য হোক বলে।' এতদিনে ধর্মমুমুক্ষুরা চৈতন্যের পেছনে ছোটাছুটি করেছিলেন, এবার বিজ্ঞানও হোঁচট খেতে খেতে শুরু করেছে চৈতন্য বা চেতনার অনুসন্ধান। কিছুদিন আগে এই ভবিষ্যদ্ বাণী করে গিয়েছিলেন এক বিজ্ঞানী ফ্রিটজফ কাপরা, তাঁর লিখিত বই 'দ্য তাও অব ফিজিক্স'-এ লিখেছেন— 'পরিশেষে (ধর্ম ও বিজ্ঞানের) উভয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই স্বীকার করা হয় যে, প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা করার জন্য আগামীকালের তত্ত্বে হয়তো 'চেতনা'কে বিশ্বের একটি অপরিহার্য উপাদান রূপে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।' ভারতীয় দর্শন হাজার হাজার বছর আগে যে তত্ত্বে উপনীত হয়েছিল আজকের ব্যবহারিক বিজ্ঞান এবার সেইদিকে এগোচ্ছে। শতবছর পূর্বে তাই দেখে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—'হিন্দু যুগ যুগ ধরে যে ভাব হৃদয়ে পোষণ করে আসছে, সেই ভাব আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের নতুনতর আলোকে আরও জোরালো ভাষায় প্রচারিত হওয়ার উপক্রম দেখে আমার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হচ্ছে। এই একশো বছরে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে, তার অধুনালব্ধ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলি আমাদের আরও পুলকিত করছে এবং হিন্দুধর্মের ভাবসমূহ আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে আমরা দেখছি।'

মহাকাশে চন্দ্র পৃথিবীকে পরিক্রমা করে চলেছে, পৃথিবী সূর্যকে, আবার সূর্যও তার গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে এক অজানা কেন্দ্রকে ঘুরে ছুটে চলেছে। পরমাণুকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছেন পদার্থবিজ্ঞানীরা। সেখানেও তারা একই খেলা দেখতে পেলেন। পরমাণুর ভিতর প্রোটনকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রন ঘুরছে। কিন্তু আশ্চর্যভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে ইলেকট্রনগুলি। লাফ দিয়ে এক কক্ষ ছেড়ে অন্য কক্ষে চলে যাচ্ছে, প্রকৃতির কোনও বাধানিয়মে চলছে না। কখন কোথায় যাবে, কোথায় তার স্থিতি হবে, কোনও গণনা কাজ করছে না এখানে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে কোনও স্বাধীন চেতনা ইলেকট্রনগুলির মধ্যে কাজ করে চলেছে। তার অবস্থান, গতি সবই অনুমানের বাইরে। বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ তা লক্ষ্য করলেন, জন্ম নিল তাঁর 'ল' অব আনসার্টেইনিটি। বৈদ্যুতিক তারে ও তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভিতরে পরমাণুর স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণে ইলেকট্রনের এই অদ্ভুত আচরণ দেখে বিজ্ঞানী এডিংটন পরমাণুর আভ্যন্তরিক শক্তির মধ্যে চেতনার অস্তিত্ব অনুমান করলেন। সর্বভূতে চেতনার কথা বিজ্ঞানে এই প্রথম বলা হলো। কোনও পদার্থে যখন স্বপ্রকাশ কোনও জ্ঞান বা স্বতন্ত্র ক্রিয়াশক্তি দেখতে পাওয়া যায় তাকেই চেতন বলা হয়; তন্ত্রে যাকে চৈতন্যময়ী বলা হলো। শক্তি ও

চৈতন্য দুই-ই অভেদ। আর এই অভেদ চৈতন্যশক্তির লীলাখেলা চলছে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। শুধু ইলেকট্রন নয়, এরকম প্রায় পঁচিশটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞান এখনও মূক হয়ে রয়েছে। তাই যখন আমেরিকার কাভলি ইনস্টিটিউটে এক সভায় পদার্থবিদ্যায় অন্যতম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ড. ডেভিড গ্রস মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন, তখন তিনি বললেন—'The most important product of knowledge is ignorance.' বিজ্ঞ দার্শনিকের ভাষায় 'কিছুই জানি না আমি, এইমাত্র' জানি।

সৃষ্টিতে দু ধরনের পদার্থের কণা দেখতে পাওয়া যায়, যারা একটি পদার্থের গঠনের মূলভূত হিসেবে কাজ করে, যেমন কোয়ার্ক, ইলেকট্রন এদেরকে বলা হয় ফার্মিয়ন। আরেকটি হচ্ছে যেটি পদার্থের কণাগুলির শক্তির মধ্যে সমতা স্থাপন করে যেমন ফোটন, গ্লুয়ন, ডব্লু এবং জেড পার্টিকলস— যাদের বলা হয় 'বসন'। এটির নামকরণ হয়েছে ভারতীয় বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রতিটি ফার্মিয়ন কণার সঙ্গে রয়েছে বসনের একটি কণা। যদিও সেইভাবে তার অস্তিত্ব এখনও প্রমাণ করা যায়নি বা অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। আবার ১৯২৮ সালে নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী ডিরাক তাঁর গণনার মাধ্যমে দেখালেন প্রতিটি পার্টিকলের বিপরীতে থাকতে পারে একটি অ্যান্টি পার্টিকল। ১৯৩২ সালে গবেষণাগারে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন কেবলমাত্র পজিশনকে যেটি ইলেকট্রনের অ্যান্টি পার্টিকল। হিন্দুশাস্ত্র বলেছে পুরুষ প্রকৃতি, শিবশক্তি, আকাশ-প্রাণ ইত্যাদি পদার্থকণার তাদের ভাষায় সুপারপার্টনার এখনও খুঁজে পাননি, তবে বিজ্ঞানীরা এটিকে তাঁদের চ্যালেঞ্জ বলে গ্রহণ করেছেন। উদ্ভুত হয়েছে আর একটি তত্ত্ব যার নাম তাঁরা দিয়েছেন 'Supersymetry'। তাঁদের অনুমান, এই সুপার পার্টনারগুলি অচ্ছেদ্য, অভেদ্যভাবে রয়েছে, যার জন্য তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের শাস্ত্রে আবারও বলা হলো, পুরুষ প্রকৃতি, শিবশক্তি অভেদ। বিজ্ঞানীরা বলছেন এই সুপার পার্টনারদের অস্তিত্ব ধরতে পারলেই তবে সৃষ্টির সম্পূর্ণ বর্ণনা করা সম্ভব। অনেক বিজ্ঞানীই ফার্মিয়ন

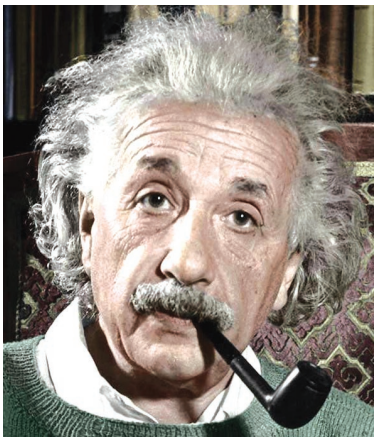

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

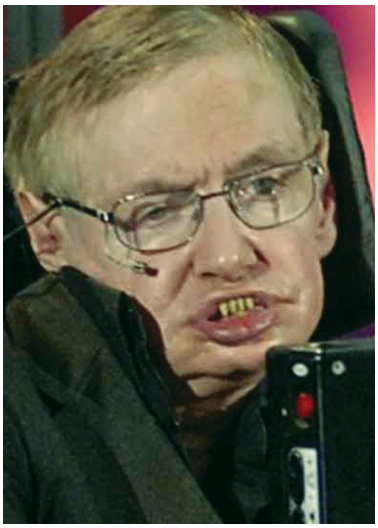

স্টিফেন হকিন্স

ও বসনের পার্থক্যকে 'ইলিউশন' অর্থাৎ 'মায়া' বলছেন।

মহাকাশ বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন, আমাদের এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে শূন্যে একটি শক্তির বিরাট বিস্ফোরণ থেকে। এটি সম্ভবত ঘটে থাকবে প্রায় ১২০০ কোটি বছর পূর্বে। ১৯২৯ সালে মহাকাশ বিজ্ঞানী এডউইন হাবল দেখলেন মহাকাশের নক্ষত্র পথগুলি পৃথিবী থেকে মহাগতিতে দূরে সরে যাচ্ছে। এইভাবে সমগ্র বিশ্ব ক্রমে প্রসারিত হয়ে চলেছে। মহাজগতের এই সম্প্রসারণ থেকে বিজ্ঞানীরা ধারণা করলেন খুবই ঘনীভূত বস্তু হতে এই বিশ্বজগৎ উৎপন্ন হয়ে তা ক্রমেই একে অপরের থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছে। ১৯৬৫ সালে বিজ্ঞানী আর্নো পেঞ্জোয়াস ও রবার্ট উইলসন ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন থেকে বিগ ব্যাং থিয়োরির উপস্থাপনা করেন। এই থিয়োরির সঙ্গে অদ্ভুত মিল রয়েছে শ্রীমৎভাগবতের সৃষ্টি বর্ণনায়, মনু সংহিতাতেও যার উল্লেখ রয়েছে 'সকল পদার্থ ক্ষোভিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইল। তাহার পর সেই সকল হইতে এক অচেতন অন্ত উৎপন্ন হইল। সেই অন্তেই ভগবান হরির মূর্ত স্বরূপ লোকসমূহ বিস্তৃত হইলেও এই বিশ্ব আবৃত করিয়া আছেন। মায়ার অধীশ্বর সেই ঈশ্বর বিবিধ রূপ ধারণ করিতে ইচ্ছা করিয়া আত্মমায়া দ্বারা যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত কাল, অদৃষ্ট, প্রকৃতি আশ্রয় করিয়াছিলেন। সৃষ্টির পূর্বে তাহলে কী ছিল? শূন্য থেকে এক বিরাট বিস্ফোরণে সৃষ্টি হওয়ার গল্পটি অনেক বিজ্ঞানীর কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকছে। আবার সৃষ্টির শেষে পার্টিকল ও অ্যান্টি পার্টিকল যোগে কি আবার সব শূন্য হয়ে যাবে? উত্তর খুঁজছে বিজ্ঞান। বেদ বলেন, সৃষ্টির পূর্বে বা পরে সেই অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই অবস্থান করছিলেন এবং করবেন।

হিন্দুশাস্ত্র বলছে ঈশ্বর প্রাপ্তকাল, প্রকৃতি ইত্যাদি আশ্রয় করে আছেন। সৃষ্টির পূর্বে কাল বলে কিছু ছিল না। তন্ত্রে তিনি তাই মহাকাল, আবার মহাকালী। হিন্দুশাস্ত্রে আবারও বলা হল সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার এক মুহূর্ত মর্ত্যলোকের সহস্র বছর। গত শতাব্দীর প্রথমদিকে আইনস্টাইন উপস্থাপন করলেন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্ব। এই তত্ত্বেই বিজ্ঞান প্রথম জানাল স্থানভেদে সময় বিভিন্ন হতে পারে। পদার্থ ও শক্তি অভিন্ন। 'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তি রূপেণ সংস্থিতা।' ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন তাঁর এই তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন, কিন্তু তারও আগে ১৮৯৬ সালে স্বামী বিবেকানন্দ এক বক্তৃতায় বলেছেন, 'দেখানো যায় যে আমরা যাকে পদার্থ বলি তার কোনও অস্তিত্ব নেই। এ শুধুমাত্র শক্তির একটা রূপ দৃঢ়তা, কাঠিন্য বা পদার্থের অন্য কোনও রূপ যে গতিজনিত, তা প্রমাণ করা যায়।' আইনস্টাইনের শক্তি ও পদার্থের অভেদ তত্ত্ব জগতে তুমুল আলোড়ন আনল। এই তত্ত্বে লোক জানতে পারল কীভাবে প্রতিটি বস্তু সময় ও স্থানের মধ্য দিয়ে বিচরণ করছে, এটি আরও প্রমাণ করল সময় স্থান থেকে পৃথক নয়। সময়ের স্থান থেকে পৃথক কোনও নিজস্ব অস্তিত্ব নেই। সেই সূত্র ধরে বিজ্ঞানীরা

বলছেন ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বরে তথাকথিত সিঙ্গুলারিটি অর্থাৎ গাণিতিক উৎসবিন্দুতে যেখানে নতুন পদার্থ জন্ম নিচ্ছে, সেখানে সময় স্তব্ধ হয়ে আছে। চণ্ডীতে আছে---'কলাকাষ্ঠাদি রূপেণ পরিণাম প্রদায়িন। বিশ্ব স্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণী নমোহস্তুতে।' তুমি কালের (সময়ের) অংশস্বরূপা হয়ে পরিণাম বিধান করছ, তুমি সমগ্র জগতের বিনাশে সমর্থা। তোমাকে প্রণাম।'

যোগশাস্ত্র মতে প্রত্যেক প্রাণীতেই ঈড়া ও পিঙ্গলা বলে দুটি নাড়ী রয়েছে। এই দুটি নাড়ীর প্রত্যেকটিই এক-একটি স্নায়ুগুচ্ছ। অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী দুটি শক্তিই ওই নাড়ীগুলি দিয়ে চলাচল করে। ওই স্নায়ুগুলির মধ্য দিয়েই মস্তিষ্কের আদেশ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। মানবের শরীরে ওই নাড়ীগুলি সর্পের আকৃতিতে অবস্থান করছে বলে যোগীরা বলেন। জীববিজ্ঞানীরা জীবের শরীরের কোষে ডিএনএ আবিষ্কার করেছেন। এর গঠন বিজ্ঞানের ভাষায় double helix structure — যোগশাস্ত্রের ঈড়া-পিঙ্গলা নাড়ীর মতোই। বিজ্ঞানীদের মতে, শরীরের সমস্ত আদেশ বহন করে চলেছে ডিএনএ। কিন্তু যোগশাস্ত্রে যে সুষুম্না নাড়ীর কথা বলা হল তার কোনো নিদর্শন মেলেনি বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রে। যোগশাস্ত্র মতে ঈড়া-পিঙ্গলা নাড়ী দুটিকে যোগের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করে সুষুম্নার ভিতর শক্তির সঞ্চার করা যায় তবেই ঘটে চৈতন্যের পূর্ণবিকাশ। সাধারণ লোকের সুষুম্না নাড়ীর মুখ বন্ধ অবস্থায় থাকে। মানব শরীরে রয়েছে কোটি কোটি ডিএনএ এবং একটি ডিএনএতে রয়েছে কোটি কোটি মেসেজ। বিজ্ঞান কি এগুলিকে কোনওদিন জানতে পারবে বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে? ডিএনএ-র পার্থক্যের জন্যই মানুষ পশু থেকে উন্নত হয়েছে।

কেবল পরমাণু বা মহাকাশে সৃষ্টির অনুসন্ধান পদার্থবিজ্ঞানীদের আজকের দিনে সন্তুষ্ট রাখতে পারছে না। তারা জানতে চাইছেন চেতনার উৎস কোথায়, প্রাণের আবির্ভাব কীভাবে? কালো পদার্থ কীভাবে সুদূরের নক্ষত্রগুলিকে আমাদের কাছে উদ্ভাসিত করছে? এই কালো পদার্থ কিভাবে সৃষ্টিকে প্রসারিত করে চলেছে যখন মধ্যাকর্ষণ শক্তি গ্রহ-নক্ষত্রগুলি পরস্পরকে আকর্ষণ করছে? সৃষ্টির পূর্বে সময় বলে কিছু ছিল কি না ইত্যাদি প্রশ্নও বিজ্ঞানীদের উদ্‌ভ্রান্ত করে রেখেছে। স্যার আইজাক নিউটন মধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেও ধরতে পারছিলেন না মহাকাশে গ্রহ, নক্ষত্র একটি অপরটিকে কী করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি একে কোনো ধী-শক্তির কাজ বলে ভেবেছিলেন। আইনস্টাইন তাঁর স্পেস-টাইমে গতির জন্য গ্রহ-নক্ষত্রের এই বক্রগতি তিনি তা তাঁর তত্ত্বে দেখালেন। কিন্তু তবুও আইনস্টাইন বলেছিলেন, 'Science without religion is lame, Religion without science is blind.' ড. ডেভিস গ্রসকে প্রশ্ন করা হল, কোনো শিশুর মধ্যে চেতনার প্রারম্ভের পরিমাপ কি করা যায়? গ্রস উত্তর দিলেন বিজ্ঞানে প্রথম চেতনার সংজ্ঞা নিরূপণ করতে হবে। বরফ যেমন গলে গেলে তার ব্যবহারের পার্থক্য ধরা দেয়, তেমনি সে কোনো মাইক্রোস্কোপিক পরিবর্তন চেতনার পার্থক্য ধরাতে পারে।' প্রশ্নটির এভাবে উত্তর দিলেন ড. গ্রস, কারণ পূর্ণ চৈতন্য কি বিজ্ঞানে এখনও অজানা? চণ্ডীতে আরও বলা হয়েছে—'যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।' যে দেবী চৈতন্যময়ী, সর্বশক্তিময়ী, তিনিই সর্বভূতে ভ্রান্তি রূপে অবস্থান করছেন। এই ভ্রান্তি দ্বারাই আমাদের মন-বুদ্ধি পরিচালিত হচ্ছে। চৈতন্য, শক্তি ও ভ্রান্তিতে পড়েই আমাদের এই অবস্থা। অনেক জানার পরও নিজেরা কিছুই জানেন না বলছেন জ্ঞানী এবং বৈজ্ঞানিকরা। হিন্দুশাস্ত্রে বলা হয়েছে ঈশ্বর বা চৈতন্য বাক্য, মন বা বুদ্ধির অতীত। মন, বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে বোঝা যায় না। ড. গ্রসকে যখন আবার প্রশ্ন করা হলো—'পদার্থ বিজ্ঞানে কি এখনও গুরুত্ব পেতে থাকবে?' উত্তর দিয়েছিলেন ড. গ্রস ছোট্ট একটি শব্দে 'হ্যাঁ'। যেমন বলেছিলেন আর এক বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিন্স 'আজ আমরা গভীর আগ্রহে জানাতে চাইছি আমরা কেন এখানে এসেছি, কোথা থেকেই বা এসেছি, মানবের জানার গভীরতম আগ্রহ আমাদের এই অনুসন্ধানের কাজের জন্য পর্যাপ্ত এবং অমাদের লক্ষ্য বিশ্বের সৃষ্টির পূর্ণ বিবরণ, অন্য কিছু নহে।' সম্ভবত চেতনার উৎস নির্ধারণ করতে পারলেই তাদের সেই লক্ষ্য পূর্ণ হতে পারে। কিন্তু তা হবে কি? গাছপালা, জীবজন্তু ও মানুষের মধ্যে এই চেতনার পার্থক্য কোথায় এবং কেন হচ্ছে? আবার পূর্ণ চৈতন্যের সংজ্ঞাই বা কী হবে। প্রাচীনকালে ভারতীয় মুনি-ঋষিরা চিন্তাভাবনা করে যে ধারণা তাদের মনে আসত, মানসচক্ষে তাই দেখে তাঁরা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন। পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রে আছে— 'ধ্রুবে তদ্‌গতি জ্ঞানম্'। ধ্রুবনক্ষত্রে সংযম করলে সমগ্র জগতের জ্ঞান হয়। 'ভুবনজ্ঞানং সূর্যে সংযমাৎ।' সূর্যে সংযম করলে সমগ্র জগতের জ্ঞান হয়। অপরপক্ষে বিজ্ঞানীরা তাদের ধারণাগুলোকে বাস্তবচক্ষে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেন। মানসচক্ষে ও বাস্তবচক্ষে দেখার বর্ণনার ফাঁক তাই রয়েছে ধর্ম ও বিজ্ঞানে। অনেক বিজ্ঞানীই কিন্তু ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের মেশানো পছন্দ করেন না। তারা ধর্মকে কেবলমাত্র বিশ্বাস বলে মনে করেন। ধর্মকে বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়াতে তারা কোনও মতেই রাজি নন। তবু তাঁরাই আবার প্রশ্ন তুলেছেন—'Is the universe designed–why does the universe exist at all?' হিন্দু দর্শনে তার উত্তর খোঁজা হয়েছে হাজার হাজার বছর আগেই। তাঁরা দেখেছেন ঈশ্বর আছেন এ কথা যেমন প্রমাণ করা যায় না, তেমনি এই ব্রহ্মাণ্ডের পেছনে একজন ব্রহ্মা দাঁড় না করালে জগতের ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই হিন্দুশাস্ত্রে বলা হয়েছে এই সৃষ্টি ঈশ্বরের বিলাস, চৈতন্যের লীলা। সেই ভাব অনুসরণ করেই বোধহয় এক বিজ্ঞানী তার নবীনতম গ্রন্থের নাম দিলেন—'The Creation of Universe–God's Luxury' কিন্তু তার আগে বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংসকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—'অনেকেই মনে করেন আপনি যোগ্যভাবে ঈশ্বরকে বর্জন করেছেন। এখন আপনি কি তা অস্বীকার করেন?' উত্তর দিয়েছিলেন বিজ্ঞানী তাঁর নিজের ভাষায়—'All that my work has shown is that you do not have to say that the way the universe began was the personal whim of God. But still you have the question : Why does the universe bother to exist? If you like you can define God to be the answer to that question.'

(লেখক অসম সরকারের পূর্বতন সহকারী বাস্তুকার)

চিঠিপত্র

সময়োপযোগী তথ্যসমৃদ্ধ লেখা

পত্রলেখক স্বস্তিকার নিয়মিত পাঠক। গত ২৭ জানুয়ারির স্বস্তিকায় মহেশ জেঠমালানির 'সংবিধানসম্মত নাগরিকত্ব আইন বিরোধীদের ছলনায় অবরুদ্ধ' রচনাটি খুবই সময়োপযোগী ও সমৃদ্ধ। নাগরিক সংশোধন আইন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে চারিদিকে ক্ষোভ-বিক্ষোভ খুবই হচ্ছে। এই আইনের মূল বিষয় বা উদ্দেশ্য যে ছিন্নমূল বাঙ্গালি, হিন্দু এবং কয়েকটি বিশেষ ধর্মের উৎপীড়িত মানুষদের ভারতে আত্মপ্রতিষ্ঠা দেওয়া একথা স্বস্তিকার পাতাতে বহু লেখার মাধ্যমে পরিষ্কার করা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশিষ্ট আইনজীবী মহেশ জেঠমালানির লেখার মধ্যে কিছু অজানা ও অন্তর্নিহিত অর্থ একেবারে প্রাণোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দুটি বিষয় এই নিবন্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবে তোলা হয়েছে। এক, অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের নাগরিকত্ব দেওয় হবে না। পাকিস্তানে ও ভারতে মুসলমানদের গরিষ্ঠ অংশ আহমদিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত মুসলমানদের তীব্র ঘৃণা করে, তাদের উপরে নির্যাতন চালায় ও পাকিস্তান থেকে তাড়াবার সবরকম ফন্দিফিকির চালায়। এদের আশ্রয় দেওয়ার অর্থ কেবলমাত্র গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতিকে আমন্ত্রণ করা। দ্বিতীয়ত, রোহিঙ্গাদের বিষয়ে তিনি জানিয়েছেন যে তারা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা নয়। ইংরেজদের শ্রম আইনে রোহিঙ্গা প্রদেশে তাদের চালান করা হয়েছিল। বহু রোহিঙ্গা মুসলমান মায়ানমারের বহু প্রদেশের বার্মিজ ভাষায় কথা বলে। তারা সেখানে শান্তিতে বসবাস করছে। এই বিশেষ রোহিঙ্গদের মায়ানমার হয়ে বাংলাদেশ টপকে ভারতে আশ্রয় দেওয়া কেবলমাত্র মুসলমান তোষণ ও ভারতীয় সংস্কৃতি ধ্বংস করার হীন প্রচেষ্টা মাত্র। বিশিষ্ট আইনজীবী জেঠমালানি তার এই প্রতিবেদনে এটি পরিষ্কার ব্যক্ত করেছেন। জেঠমালানির Spirit of the Word যথাযথ ভাবেই আমাদের জ্ঞাতব্যের মধ্যে এনেছেন। এরূপ একটি প্রতিবেদন সময়োপযুক্ত ভাবেই ছাপা হয়েছে। সম্পাদককে জানাই অভিনন্দন ।

—**সুচরিতা লাহা,**
শিবপুর, হাওড়া।

পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে আসা হিন্দুদের দুর্মতি

বাংলাদেশে হিন্দু নাগরিকদের ওপর অত্যাচার, নির্যাতন, ধর্মান্তরকরণের ঘটনা ক্রমশ ঘটেই চলেছে। শুধুমাত্র এই নয়, হিন্দুমন্দির এবং দেবদেবীর মূর্তি ভাঙা, দেবোত্তর সম্পত্তি অনৈতিকভাবে দখল করা প্রায়শ ঘটে চলেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইসব অন্যায়ের কোনও সুরাহা হয় না। কারণ প্রশাসনের ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের মদতেই এই সমস্ত ঘটে থাকে। খুবই আশ্চর্যের যে, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের এসব নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই, যদিও তাদের পূর্বপুরুষদের অনেককেই পূর্বপাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে মুসলমানদের অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে নিজেদের পৈত্রিক ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে, নিজেদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের নৃশংসভাবে নিহত হতে দেখে, মুসলমানদের দ্বারা অপহৃতা নিজেদের স্ত্রী, কন্যা, ভগিনীদের উদ্ধার করতে না পেরে, এক বস্ত্রে কপর্দকশূন্য অবস্থায় রাতের অন্ধকারে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন এই পশ্চিমবঙ্গে। তাদের পরবর্তী প্রজন্মও এসব নিয়ে এতটুকুও চিন্তিত নয়, ভাবিত নয়। এদের অধিকাংশই বামপন্থী হয়ে গেছেন। এরা কলকাতায় রাস্তা অবরোধ করে বিশাল বিশাল মিছিল করেন আর গলার শিরা ফুলিয়ে স্লোগান দেন আমেরিকা আর ইজরাইলের বিরুদ্ধে। বর্তমানে ভারত সরকারের বিরুদ্ধেও এনআরসি আর সিএএ-এর বিরোধিতায় এবং অতি অবশ্যই মুসলমানদের এবং পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় থাকা তৃণমূল কংগ্রেসের সুনজরে থাকতে। এরা অতীতকে ভুলে গেছেন। কেন তাদের পূর্বপুরুষদের নিজেদের পিতৃপুরুষদের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হতে হয়েছিল, কেন তাদের মা, ঠাকুমা, দিদিমাদের অপহৃতা হতে হয়েছিল, কেন তাদের ধর্মান্তরিত হতে হয়েছিল, কেন তাদের পরে আর উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি? এরা এখন মিটিং, মিছিলে গান করেন ''একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান...।'' এরা শুধু যে নিজেদের সর্বনাশ নিজেরা ডেকে আনছেন তা তো নয় পশ্চিমবঙ্গকেও বিপদগ্রস্ত করে তুলছেন। এখন প্রয়োজন এদের বনবাসে পাঠানো, না ১৪ বছরের জন্য নয়, চিরতরে। বর্তমানে এরা আবার বাংলাদেশি শিল্পীদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ঘটাতে বাংলাদেশ থেকে শিল্পী ভাড়া করে নিয়ে আসছেন। আরও কী করছেন জানা নেই।

—**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
বড়বাজার, চন্দননগর-৭১২১৩৬।

শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদান অনেকেরই মাথাব্যথা

শরণার্থী হিন্দুরা নাগরিকত্ব পাক এটা অনেক নেতা-নেত্রীই চায় না। তারা আবার রোহিঙ্গা অহিন্দু এবং বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের জন্য খুবই চিন্তিত। শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দিলে নাকি দেশ আবার বিভাজনের পথে যাবে, সাম্প্রদায়িকতা নষ্ট হবে। দেশ ধীরে ধীরে হিন্দুরাষ্ট্রের দিকে এগোবে। এ বড়ো আজগুবি কথা। দেশ তো ভাগ হয়েছিল হিন্দু-মুসলমানের ধর্মের ভিত্তিতেই। সবাই তো হাতিয়ে নিয়েছে তাদের অধিকার, সেখানে ভারতের বেলাতেই সবাই দোষ খুঁজে পেয়েছে। ভারত হিন্দুরাষ্ট্র হলে কি এখানে থাকা অহিন্দুদের তাড়িয়ে দেওয়া

হবে। আমাদের এখানে যে সমস্ত স্থায়ী অহিন্দু বসবাস করছে তারাও তো এটাতে বাধা দিচ্ছে না। কারণ তারাও বোঝে, তারাও ইতিহাস পড়েছে। এতে প্রমাণিত হয় বুদ্ধিমান ব্যক্তির চিন্তাধারা সবসময় একই হয়ে থাকে। বাকিদের চিন্তাভাবনার সঙ্গে এদের যথেষ্ট তফাত বর্তমান। এর প্রমাণ আমরা যথেষ্ট পেয়েছি। যেমন অনেক স্থানে সহায়সম্বল হীন হিন্দু মারা গেলে অনেক অহিন্দু অধিবাসী তার সৎকারে এগিয়ে এসেছে, এমনকী শ্রাদ্ধের কাজটা পর্যন্ত তারা নিজের খরচে সমাপ্ত করেছে। এটাই ভারতীয়তত্ত্ব, একেই বলে জাতীয়তাবোধ। এইসব চিন্তাধারার মানুষ ভারতের অহিন্দুদের মধ্যে যথেষ্ট আছে। দার্শনিক, সাহিত্যিকদের মতো এইসব উচ্চমানসম্পন্ন মুসলমান ভারতীয়দের যথেষ্ট মিল। আমার তো মনে হয় ভারতে এখনো এইরূপ মুসলমাদের সংখ্যা বহু। সিএএ-র সুবিধা সবাই পাক এটা পশ্চিমবঙ্গের অনেক নেতা-নেত্রীই সুপারিশ করেছেন। সবচেয়ে পার্লামেন্টে বেশি সুপারিশ করেছেন মাত্র ২-৩ মিনিটে , বিশিষ্ট সমাজসেবী রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার। যেটা মুহূর্তেই ভাইরাল হয়েছে। এই সদর্থক চিন্তাভাবনার জন্য জগন্নাথবাবুকে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের নাগরিকত্বহীন শরণার্থী মানুষদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট ধন্যবাদ।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর।

প্রয়াত অসীম মিত্র

প্রয়াত হলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক অসীম মিত্র। এক সময়ে তাঁর বহু লেখা এই পত্রিকায় পাঠ করেছি। আমরা হারালাম একজন নামি সাংবাদিককে। সংবাদপত্র জগতে নেমে এলো শূন্যতা। স্বস্তিকা পত্রিকা তাঁকে যথাযথ ভাবে স্মরণ করেছে। তাঁর মৃত্যুতে আমরা সুগভীর মর্মাহত।

—অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়,
১, পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৬।

দেশ ভাগের যন্ত্রণা

এইতো সেদিন নবতিপর বৃদ্ধ সাথে কথা
বৃদ্ধ শোনায় দেশ ভাগের দুঃখ অভিজ্ঞতা।
বাড়ি ছিল মৈমনসিংহ, ত্রিশাল থানায়
একদিন এক বর্গাচাষি চুপিসারে জানায়
'কর্তাবাবু এদেশ ছেড়ে পালান তাড়াতাড়ি
নইলে ওরা জ্বালিয়ে দিবে পোড়াবে ঘরবাড়ি।'
এটাই তখন রীতি রেওয়াজ পূর্ব পাকিস্তানে
হিঁদুর বাড়ি দখল করে মত্ত মুসলমানে।
সময়টা সেই পাঁচের দশক স্বাধীনতার পরে
মা বোনের ধর্ম লুট হিঁদুর ঘরে ঘরে।
সাত পুরুষের ভিটে মাটি, মায়ার বন্ধন
সকল ছেড়ে পালায় যখন, সবার ক্রন্দন
আকাশ ফুঁড়ে উঠেছিল, হেসেছিল ওরা
'এ দেশ ছেড়ে যা পালিয়ে, পালিয়ে যা ত্বরা।'
আজকে যাঁরা বুদ্ধিজীবী, ভুলেছে সেদিন
এমনি কী আর বঙ্গহিঁদুর অবস্থা সঙ্গীন
সিএএ-র বিরোধিতা করছে যারা আজ
স্মৃতিহীন ভুলেই গেছে পূর্বজনের লাজ।

—অশোক কুমার ঠাকুর,
কামেশ্বরী রোড পূর্ব, কোচবিহার।

সিনেমার বিপণনে রাজনীতি

বিপণন এমন একটি কৌশল যার মাধ্যমে খারাপ এবং মাঝারি মানের মালকেও বাজারে চলনসই বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। শুধু মালই বা কেন, নির্ভেজাল মিথ্যেও গিলতে সাহায্য করে বিপণন। রাজনীতি থেকে শুরু করে ক্রিকেট, মায় ক্রিকেটাররা পর্যন্ত এখন বিপণনের হাতিয়ার। বিশেষ করে সিনেমার বিপণনে রাজনীতির ব্যবহার আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে দেখে আসছি। কিছুদিন আগে দীপিকা পাড়ুকোনকে জেএনইউতে দেখা গেছে। তিনি টুকরে গ্যাঙের পাশে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিয়েছেন, হাত-পা ছুঁড়েছেন। উদ্দেশ্য, সিএএ বিরোধী রাজনৈতিক বিতর্ককে কাজে লাগিয়ে নিজের ছবিটি হিট করানো। যদিও তার সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি। ছবি বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছে। কিন্তু এই আচরণের মাধ্যমে তিনি সিনেমা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত এক শ্রেণীর কলাকুশলীর মনের ভাবটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এইসব কলাকুশলীর মধ্যে রয়েছেন অনুরাগ কাশ্যপ এবং স্বরা ভাস্বর। দুজনেই পেশার দিক থেকে চূড়ান্ত ব্যর্থ। অনুরাগ কাশ্যপ পরিচালিত শেষ কোন ছবি হিট করেছিল তা জানার জন্য সম্ভবত মহাফেজখানার শরণাপন্ন হতে হবে। স্বরা ভাস্বর চোখে পড়েছিলেন টাটা চায়ের বিজ্ঞাপন করে। কিন্তু তারপর? এখনও পর্যন্ত উল্লেখ করার মতো কোনও কাজ তিনি করেননি। তাই নেমে পড়েছেন নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে। তার কাজের নির্বোধ সমালোচনায় আসলে তিনি ব্যবহার করতে চান মোদীর জনপ্রিয়তাকে। মোদীর ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করে নেগেটিভ পাবলিসিটি পেতে চান। এছাড়া পায়ের নীচের মাটি শক্ত করার আর কোনও উপায় তার নেই।

—সুদীপ চাকলাদার,
আন্ধেরি, মুম্বই।

অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি সংশোধনের অনুরোধ

গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০, সংখ্যায় প্রকাশিত অতিথি কলমে (স্বামীনাথন আইয়ার) লিখিত প্রবন্ধে একটি বড়ো ভুল রয়েছে। 'দি অ্যানারকি' গ্রন্থের লেখকের নাম আলেকজান্ডার ডালরিম্পল-এর পরিবর্তে হবে উইলিয়াম ডালরিম্পল। দ্রুত সংশোধন করার জন্য সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—বিপ্লব কুমার সরকার,
ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর।

রুক্মণী বাকরের জীবন সকলের প্রেরণাস্বরূপ

অঙ্গনা

সুতপা বসাক ভড়

এই সত্যকাহিনি এমন একজন মহিলার সম্বন্ধে, যিনি বিপরীত পরিস্থিতিতেও কখনও হার মানেননি। আমাদের বিশ্বাস ঈশ্বর কখনও কারোর

সঙ্গে অবিচার করেননি। কাউকে কোনো কিছু কম দিলে, ভালোটাও দেন উজাড় করে। এমনই একজন ব্যক্তিত্ব হলেন ছত্তিশগড়ের রায়পুর রেলওয়ে স্টেশনের এনকোয়ারি কেন্দ্রের ক্লার্ক পদস্থ রুক্মণী বাকরে।

রুক্মণী দৃষ্টিশক্তিহীন, কিন্তু তাঁর স্মৃতিশক্তি এমন যে ওই স্টেশন দিয়ে চলা প্রতি ১০৯টি ট্রেনের নাম, নম্বর, কোন প্ল্যাটফর্মে কতক্ষণ দাঁড়াবে, কখন পৌঁছাবে, কখন ছাড়বে ইত্যাদি সবকিছু তাঁর নখদর্পণে! রেলবিভাগ তাঁর এই গুণের জন্য প্রশংসা করেছে। তাঁর এই কার্যকুশলতার জন্য রেলবিভাগ তাঁকে পুরস্কৃত করেছে।

রুক্মণী জানায়, জন্মের কিছুদিন পরে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। মার পক্ষে এই ধাক্কা কাটিয়ে ওঠা খুবই কষ্টের ছিল। তার ওপর দৃষ্টিশক্তিহীন, মেয়ের দায়িত্ব। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই জানা গেল যে দৃষ্টিহীন হলেও রুক্মণীর স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। এরপর আর পেছন ফিরে দেখতে হয়নি। রুক্মণীর মা ঠিক করেন, তিনি তাঁর মেয়েকে অনেক লেখাপড়া শেখাবেন। রুক্মণীর মতে, সে যত বড়ো হয়ে উঠছিল তত তাঁর প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর হয়ে উঠেছিল যে কারুর ওপর নির্ভরশীল না হয়ে সে তার নিজের পায়ে দাঁড়াবে। তাঁর মায়ের আশ্রয় হবে সে নিজে।

ব্রেইল লিপির মাধ্যমে পড়াশুনা শুরু করে। উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়। ২০১১ সালে বিলাসপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাশ করে। এরপর রেলের চাকরির পরীক্ষার জন্য চেষ্টা শুরু করে। তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি এবং দৃঢ় আত্মবিশ্বাস হলো তাঁর প্রধান শক্তি। সে একবার যা পড়ে বা শোনে, তা মুখস্থ হয়ে যায়। তাঁর প্রতিভা এবং প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ২০১৫ সালে রেলের চাকরি পায়। কার্যক্ষেত্রে স্টেশনে ট্রেনের যাতায়াত সম্বন্ধিত নানা ঘোষণা এবং ওয়াকিটকির মাধ্যমে ট্রেনের যাতায়াতের বিলম্বের বা প্ল্যাটফর্ম বদলের সূচনা সম্বন্ধে তিনি জানতে পারেন এবং শীঘ্রই তা মুখস্থ করে নেন। সাধারণ মানুষের মতো লেখার প্রয়োজন তাঁর হয় না।

রুক্মণীর প্রতিভা দেখে প্ল্যাটফর্মে আসা লোকজনও বিস্মিত হয়ে যায়; যখন তারা জানতে পারে যে, তাদের যে সহায়তা করে চলেছে, সে একজন অন্ধ— চোখে দেখতে পায় না। কাউন্টারের সামনে কেউ এসে দাঁড়ালে, সে অনায়াসেই উপস্থিতি টের পেয়ে যায় এবং বলে ওঠে, ‘‘আপনি কী জানতে চান...?’’ চিৎকার, চেঁচামেচির আওয়াজে তেমন তিনি সতর্ক হয়ে যান; সঙ্গে সঙ্গে সারিতে দাঁড়ানো লোকেদের বকুনি লাগান যাতে তারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়, কোনোভাবেই যেন লাইন না ভাঙেন। তাঁর কার্যকুশলতার প্রশংসা স্থানীয় রেলবিভাগের কর্মচারীদের মুখে মুখে।

জীবনের নানা সময়ে আমরা আমাদের চাওয়া-পাওয়ার হিসেব-নিকেশ করি। মন্তব্য করে বসি— অন্যদের ভগবান কত কিছু দিয়েছেন, আমাকেই কিছু কম করে দিলেন। রুক্মণী মনে করেন, ভগবান তাঁকে কী দিয়েছেন এবং যা দেননি সেজন্য মনখারাপ করে সময় নষ্ট না করে, ভগবান তাঁকে যা দিয়েছেন তাই নিয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে জীবনের পথে এগিয়ে গেছেন এবং অবশ্যই সফল হয়েছেন। জীবনের কঠিন পরিস্থিতিকে জয় করেছেন, ভগবানের দেওয়া শক্তি দিয়ে দৃষ্টিহীন হওয়া সত্ত্বেও নিজের মায়ের অবলম্বন হয়ে উঠেছেন তিনি। একজন সাধারণ ঘরের মেয়ের পক্ষে জীবনের পথে এই সংঘর্ষ এবং বিজয়ী হওয়া অবশ্যই প্রশংসাজনক। তাঁর দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি অবশ্যই অন্য মহিলাদের উৎসাহিত করবে। রুক্মণী বাকরে আজ কেবলমাত্র একজন সফল ব্যক্তিত্ব নন, তিনি সকলের অনুপ্রেরণা! ■

কিডনি সুস্থ রাখতে যে খাবার খাবেন

রিংকী ব্যানার্জি

আপনি যা খাবেন তাই আপনার স্বাস্থ্যে প্রতিফলিত হবে। যে কোনো অঙ্গের মতোই কিডনির সুরক্ষায়ও বিশেষ কিছু খাবার দরকার হয়। স্বাস্থ্যবান হৃদপিণ্ডের মতোই একটি স্বাস্থ্যবান কিডনি থাকাটাও জরুরি। কিডনির প্রধান কাজ হলো দেহ থেকে বর্জ্য বের করে দেওয়া এবং ক্ষতিকর টক্সিন বা বিষ অপসারণের মাধ্যমে দেহ থেকে অতিরিক্ত জল বের করে দেওয়া। এছাড়াও কিডনি ইলেকট্রোলাইটস এবং অন্যান্য তরলের ভারসাম্য রক্ষা করে। এমনই গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গকে সুস্থ রাখার জন্য সঠিক কিডনির উপকারী খাদ্যাভাসও জরুরি। এখানে এমন ১২টি খাদ্যের নাম দেওয়া হলো যেগুলো কিডনির সুরক্ষায় নিয়মিত খেতে হবে।

(১) **বাঁধাকপি :** এতে আছে ফাইটোকেমিক্যালস, ভিটামিন বি-৬, ভিটামিন সি এবং ভিটামিন কে এবং আঁশ ও ফলিস অ্যাসিড। এই সবগুলো উপাদান ক্ষতিগ্রস্ত কিডনির মেরামত এবং কিডনিকে সচল রাখতে সহায়তা করে।

(২) **মাছ :** এতে থাকে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড যা দেহের প্রদাহ কমায় এবং কিডনিকে সুরক্ষা দেয়। যাদের কিডনিতে সমস্যা হচ্ছে তাদের বেশি বেশি মাছ খাওয়া উচিত।

(৩) **বেরি :** বেরিতে আছে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেশিয়াম, ভিটামিন সি, খাদ্য আঁশ এবং ফোলেট। স্ট্রবেরি, ক্র্যানবেরি, র‍্যাস্পবেরি এবং রুবেরি কিডনির জন্য বেশ উপকারী বলে বিবেচিত হয়। বেরিতে আছে প্রদাহরোধী এবং পচনরোধী উপাদান এবং মূত্রাশয়ের কার্যকারিতারও উন্নতি ঘটায়।

(৪) **রসুন :** রসুনে আছে পচনরোধী এবং জমাটরোধী উপাদান যা কার্যকারিকভাবে কিডনি রোগ প্রতিরোধ করে। রসুন কিডনিকে ক্ষতিকর ধাতব পদার্থের সম্ভাব্য ঝুকি থেকে রক্ষা করে।

(৫) **অলিভ অয়েল :** সকলেই জানেন অলিভ অয়েল হার্টের জন্য ভালো। কিন্তু সেটি যে কিডনির জন্যও উপকাবী তা বহু লোকের জানা নেই। এতে আছে প্রচুর পরিমাণে প্রদাহরোধী ফ্যাটি অ্যাসিড যা জারণ কমিয়ে কিডনিকে সুরক্ষিত রাখে। সালাদে বা রান্নায় এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল ব্যবহার করতে পারেন।

(৬) **ডিমের সাদা অংশ :** কিডনি রোগে

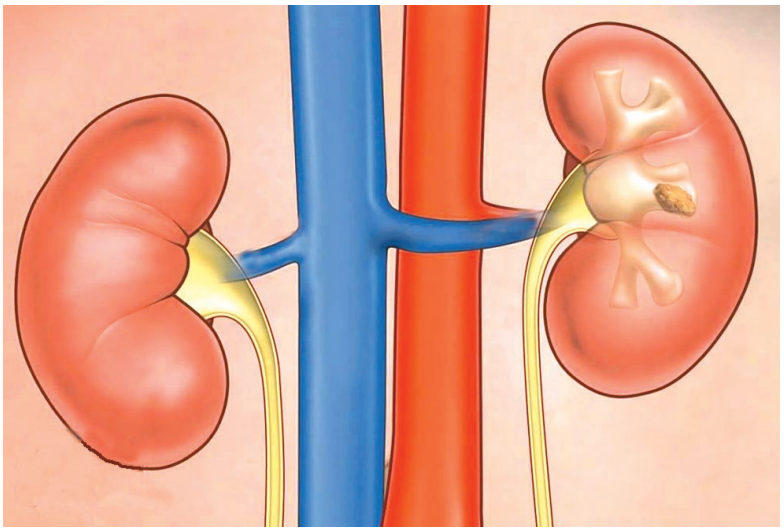

আক্রান্তদেরকে ডিমের সাদা অংশ খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। কারণ ডিমের সাদা অংশে ফসফরাসের পরিমাণ কম থাকে এবং ভালো মানের প্রোটিন বেশি থাকে। এছাড়া এতে আছে অ্যামাইনো অ্যাসিড যা কিডনির কার্যকারিতা স্বাভাবিক রাখার জন্য জরুরি। তবে কিডনির রোগ হলে ডিমের কুসুম না খাওয়া ভালো।

(৭) **লাল ক্যাপসিকাম :** এতে পটাশিয়াম কম, কিন্তু উচ্চমাত্রায় ভিটামিন এ, বি, সি এবং বি৬ আছে। এটি ফলিক অ্যাসিড এবং খাদ্য আঁশেরও ভালো উৎস। যেগুলো কিডনিকে সচল রাখার জন্য জরুরি।

(৮) **আপেল :** কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, হৃদরোগ প্রতিরোধ করে এবং দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়। এছাড়া অ্যান্টিক্সিডেন্ট বা পচনরোধী উপাদান এবং ভিটামিন থাকায় আপেল কিডনির স্বাস্থ্যও ভালো রাখে। এছাড়া রক্তে কোলোস্টেরলের মাত্রা ঠিক রাখতে এবং প্রস্রাব পরিষ্কার রাখতে বেশ কার্যকর আপেল।

(৯) **লাল আঙুর :** লাল আঙুরে আছে এমন অ্যাসিড যা কিডনির এবং প্রস্রাবের নালির জন্য ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া এবং জীবাণু মেরে ফেলে। এছাড়াও মাংসপেশিকে শিথিল করা এবং রক্তের প্রবাহ উন্নত করতেও বেশ কার্যকর লাল আঙুর।

(১০) **লেবুর রস :** লেবুতে যে অ্যাসিড উপাদান আছে তা কিডনিতে জমা হওয়া পাথর ভাঙতে বেশ কার্যকর। লেবুতে যে সাইট্রাস উপাদান আছে তা কিডনিতে থাকা ক্রিস্টাল পরস্পরের জোড়া লাগতে বাধা দেয়।

(১১) **ফুলকপি :** এতে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, ফোলেট এবং খাদ্য আঁশ। এটি লিভারের গাত্রে জমা হওয়া খাদ্যবিষ অপসারণেও সহায়তা করে। এছাড়া কোষের ঝিল্লি সংরক্ষণেও সহায়তা করে।

(১২) **পেঁয়াজ :** পেঁয়াজে আছে প্রচুর পরিমাণে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বা পচনরোধী উপাদান যা কিডনিকে বিষমুক্ত এবং পরিষ্কার করতে সহায়তা করে। পেঁয়াজে পটাশিয়াম ক্রোমিয়াম ইত্যাদি কম থাকে ফলে চর্বি, প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেটস হজমে সহায়তা করে।

(লেখিকা ন্যাচারোপ্যাথ ও অপটিশিয়ান)

বইমেলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও জনবার্তার স্টলে অতিবামপন্থীদের হামলা

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

প্রথা মেনেই বইমেলায় এবারও স্টল দিয়েছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির মুখপত্র 'ভারতীয় জনবার্তা'। বইমেলায় এবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্টলে কয়েক লক্ষ টাকার বই বিক্রি হয়েছে বলে অনুমান। জনবার্তার বিক্রিও বেশ ভালো, অন্যবারের তুলনায় বেশি তো বটেই। এখানে পরিবেশিত বইয়ের মধ্যে একটাও অসত্য ভাষণ নেই, তবুও প্রতিবারের মতো দেখলাম অতি বামপন্থী, ভিন্নমাত্রিক ভাষ্যে ইস্লামিক সংগঠনগুলি অকারণে এই দুই স্টলে হামলা চালাল। আমি অন্তত দু-তিন দিন এই হামলার প্রত্যক্ষদর্শী।

অতি বামপন্থীদের উগ্রতা।

মূলত হিন্দুত্বের বা হিন্দু ধর্মের কল্যাণের উপর লিখিত নানারকম অত্যন্ত উঁচুমানের বই এখানে পাঠকের জন্য রাখা হয়। স্বাধীনতা লাভের কিছু আগে থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বামাচারী বা অন্যান্য হিন্দুবিরোধী দল যেমন--- কংগ্রেস বা সমমনস্ক অন্য দলের অপপ্রচারের দরুন 'হিন্দু' শব্দটিই ঘৃণ্যতার দ্যোতক হয়ে গেছে। এখন তাতে উচ্চস্বরে কণ্ঠ মিলিয়েছে কিছু বাজারি পত্রপত্রিকা ও বৈদ্যুতিন মাধ্যম। প্রতিবার আমি দেখেছি ইসলামিক বুক সেন্টার, বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন থেকে ইসলামের উপর লিখিত অসংখ্য বই বিক্রি হয়, কোনো সমস্যা নেই। বইমেলার প্রবেশদ্বার থেকে সর্বত্র বিনামূল্যে বাইবেল বিতরণ করা হয়। না, কোনো সমস্যা নেই। যত সমস্যা হিন্দু বিষয়ক কোনো কিছু লেখা বা পুস্তিকা থাকলেই। অত্যন্ত বেদনা, বিষাদ ও আক্ষেপের ব্যাপার হলো, এতে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই হিন্দু, তাদের মধ্যে আবার বেশ কিছু পথভ্রষ্ট তরুণ-তরুণী।

এবারে সিএএ নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর বিরুদ্ধে নানারকম পুস্তক-পুস্তিকা বেরিয়েছে, আর সেগুলো স্টলেই বিক্রি বা বিলি করছিল এই দুটি স্টল। একথা বলা যাবে না যে এটাই এদের অর্থাৎ অতিবামপন্থী সংগঠনগুলির হামলার কারণ। প্রতিবারই এই হামলা হয়। ২০১৬ সালে তখন মিলনমেলায় বইমেলা হয়েছিল। আমি দেখেছিলাম ইসলামিক বুক সেন্টারের সামনে মাওবাদীরা, সবাই হিন্দু, হাতে স্লোগান লেখা অসংখ্য প্ল্যাকার্ড, পোস্টার নিয়ে দাঁড়িয়ে। তাতে লেখা হিন্দুত্ব নিপাত যাক, খাগড়াগড়ের অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোনো তদন্ত করা চলবে না ও সবাইকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে নিঃশর্তে। ভাবুন এর তাৎপর্য! তারপর এরাই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সামনে আসে। ওই গোষ্ঠীর তরুণ-তরুণীরা হাততালি দিয়ে নেচেগেয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল আর হিন্দু ধর্মের মুণ্ডুপাতকারী উক্তি করছিল। আমি সাক্ষী। খবর দিলে পুলিশ আসে এবং হাতে পায়ে ধরে এইসব অপরিণতমস্তিষ্ক যুবক-যুবতীদের ও তাদের ইন্ধনজোগানো পরিণতবয়স্ক কিন্তু অপরিণতমস্তিষ্ক বৃদ্ধের দলকে সরায়। আর একটু সুযোগ পেলেই এরা স্টলে শারীরিকভাবে আক্রমণ করতো। কিন্তু কখনো এই দুই প্রতিষ্ঠান অন্য কারও সামনে বা কোনোভাবে বিক্ষোভ দেখায়নি বা কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। তবু হামলা হয় বারবার।

এবার ৩১ জানুয়ারি সন্ধ্যা নাগাদ কিছু নকশালপন্থী যুবক-যুবতী বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্টলের সামনে ধেয়ে আসে মারমুখী হয়ে। পরিষদের কর্মী ও কার্যকর্তারা শান্তভাবে তার মোকাবিলা করেন। নকশালরা দেশবিরোধী স্লোগান দিতে থাকে এবং সঙ্গে হুমকি চলে। পুলিশ কোনোক্রমে অবস্থা সামাল দেয়। ৮ ফেব্রুয়ারি বিকেল চারটে সাড়ে চারটে নাগাদ বেশ কিছু উগ্রপন্থী বাম সংগঠন দলবেঁধে মারমুখী হয়ে প্রথমে 'জনবার্তা'র সামনে আসে। তাদের সঙ্গে ছিল পুলিশ বাহিনী, সুরক্ষা দিতে। তারা জনবার্তার স্টল আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। জনবার্তা স্টল থেকেও স্লোগান ওঠে 'জয় শ্রীরাম।' তারা হামলাকারীদের ঠেকাতে চেষ্টা করে। প্রায় আধঘণ্টা ধরে ধ্বস্তাধস্তি করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্টলের সামনে যায় এবং তাদের মধ্যে যতজন সম্ভব স্টলের ভিতরে ঢুকে বইপত্র ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এক যুবক, পরে তার নাম জেনেছি ঋক বন্দ্যোপাধ্যায়, সে গীতার উপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার শুরু করে। পরিষদের স্টলে বই কিনতে আসা মহিলারা ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। স্টলের কর্মীরা হামলাকারীদের বাইরে বের করে দেয় বহু কষ্টে। কিন্তু তারা নাছোড়। ধস্তাধস্তি চলে। পুলিশ কিন্তু তাদের একবারও বারণ করে না। বোঝায়ই যায় শাসক দলের সমর্থন না থাকলে তারা এই পর্যন্ত আসতেই পারত না। পুলিশ জানায়, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্টল থেকে হনুমান চালিশা বিতরণ করা যাবে না। অদ্ভুত যুক্তি! হিন্দুদের একমাত্র দেশ ভারতে হিন্দু ধর্মপুস্তক বিলি করা যাবে না, কিন্তু ইসলামিক জিহাদের বই ও বাইবেল বিলি বা বিক্রি করা যাবে। কী অদ্ভুত ফতোয়া! ■

কোণঠাসা বামেদের বইমেলায় বেলাল্লাপনা

দেবাশিস লাহা

একটি জাতিকে ধ্বংস করার সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ পন্থাটি হলো তাকে তার ইতিহাস থেকে বঞ্চিত করা, ইতিহাস বীক্ষণের বোধটিকেও চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া।

সাম্প্রতিক কলকাতা বইমেলায় আরবান নকশাল, মাওবাদী, মার্ক্সবাদীদের সম্মিলিত বেলেল্লাপনা (যাকে আন্দোলনের মুখোশ পরিয়ে মতপ্রকাশের গণতান্ত্রিক তকমা দেওয়া হচ্ছে।) দেখে 'অ্যানিম্যাল ফার্ম' খ্যাত জর্জ অরওয়েল সাহেবের উপরি উল্লিখিত উক্তিটিই বারবার মনে পড়ছিল। অরওয়েল উচ্চারিত এই পর্যবেক্ষণ, যা কোনোভাবেই প্রথম বা অভিনব নয়, ফ্ল্যাশব্যাকের মতো ফিরিয়ে আনছিল বর্বর বখতিয়ার খিলজির নালন্দা ধ্বংসলীলা, ১৪৫৩ সালের ২৯শে মে কনস্টান্টিনোপল আক্রমণকারী দ্বিতীয় মাহমুদের পৈশাচিক বিজয়োল্লাস— যে ঐতিহ্যশালী হাইয়া সোফিয়া গির্জাটি ধ্বংস করে তার উপর রাতারাতি একটি মসজিদ বানিয়ে ফেলে। বিধ্বংসী আগুনে ছারখার হয়ে যায় বাইজান্টিয়ানের গ্রন্থাগার, অনন্ত ফ্ল্যাশব্যাকের আর্তনাদ নিয়ে উড়ে আসে ৬৪০ এ ডি-র আলেকজান্দ্রিয়া! রাশি রাশি পুস্তকে সমাহিত জ্ঞানভাণ্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ইসলামি হানাদার ওমরের আস্ফালিত অট্টহাসি! আগুন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত এক বিশ্বস্ত অনুচর! তাঁর ঠোঁটেও প্রশ্ন!

এত এত বই! সব পুড়িয়ে দেবেন জাঁহাপনা? একটু ভেবে দেখুন!

পরবর্তী ফ্ল্যাশব্যাকেই ভেসে এল উত্তর—এসব বইতে যদি কোরান-বিরোধী কোনো চিন্তন থাকে, তবে কি পুড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়?

নিশ্চয় জাঁহাপনা! কিন্তু এমনও তো হতে পারে এসব বইয়ে কোরান বহির্ভূত কিছু নেই।

কোরানে যা আছে, তাই যদি থাকে, তবে এসব রেখে কী লাভ! বাড়তি জঞ্জাল! আগুন লাগাও!

না, নিছক আলেকজান্দ্রিয়া নয়, ইরান থেকে আফগানিস্তান, মেসোপোটেমিয়া থেকে মিশর, ভারত থেকে সিরিয়া, পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ 'কাফের আইডেন্টিটি' ধ্বংসের এই পৈশাচিক অট্টহাসিটিই বারবার শোনা গেছে। চূর্ণবিচূর্ণ হওয়া বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি চরম যন্ত্রণায় মুখ লুকিয়েছে কালী, দুর্গা অথবা সরস্বতীর ধ্বংসস্তূপে!

তবুও কি ফ্ল্যাশব্যাক থামে? না, কারণ বহুত্ববাদী পেগান আইডেন্টিটির শত্রু আরও একটি অশুভ শক্তি মঞ্চে এসে দাঁড়ায়। ইসলামের ছায়া থেকেই বেরিয়ে আসে মার্ক্সবাদ! হুংকার ছাড়েন লেনিন, স্তালিন, মাও! ফ্যাসিবাদ, নাজিবাদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা এই সব মহান মার্ক্সবাদী, মাওবাদীরা আইডেন্টিটির ধ্বংসলীলায় এক নতুন মাত্রা যোগ করে মুসোলিনি, হিটলারকেও লজ্জায় ফেলে দেন। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ এই দশ বছরেই (সোভিয়েত ইউনিয়নের) প্রায় দশ হাজার বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিককে কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে পাঠানো হয়। সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন প্রায় দেড় হাজার মননশীল মানুষ। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করা হয় কমিউনিস্ট বিরোধী বইপত্র, দলিল দস্তাবেজ। ১৯৩৬-১৯৪০ এই চার-পাঁচ বছর শোধন প্রক্রিয়ার (ইংরেজিতে যা great purge বলে পরিচিত) নামে নৃশংস ধ্বংসলীলাটি তীব্রতম মাত্রা ছুঁয়ে ফেলে। জিভাগো খ্যাত বরিস পাস্তারনাক স্তালিনের রোষানলে পড়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। কুখ্যাত গুলাগ (সোভিয়েত কনসেনট্রেশান ক্যাম্প) থেকে কোনমতে পালিয়ে আসা ইউজেনিয়া গিঞ্জবার্গ, ভালাম শালাকভ, নাজেদদা মান্ডালস্টামের স্মৃতিচারণা-আত্মজীবনী থেকে সেই ভয়াবহ নির্যাতনের চিত্রটি পাওয়া যায়। Government Inspector-এর নির্দেশক বিখ্যাত থিয়েটার ব্যক্তিত্ব ভাসেভোলভ মেয়েরহোল্ডের উপরও চরম নির্যাতন নেমে আসে। তাঁর স্ত্রীকেও নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। গোর্কিও নিস্তার পাননি। প্রাণ বাঁচাতে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। এমনকী মায়াকোভস্কির মতো কমিউনিস্ট কবিও স্তালিনের রোষানলে পড়েন, কারণ একটি নাটকে তিনি অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। অবশেষে তাঁকেও আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়। রেহাই পাননি জনপ্রিয় কবি ওসিপ ম্যান্ডেলস্টাইন। তাঁর কী দোষ? ওই যে, স্তালিনের বিরুদ্ধে পরিহাসমূলক কবিতা লিখে ফেলেছিলেন।

অবাক হলেন? বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও জনবার্তার স্টলে হামলা, ভগবতগীতায় লাথি মারা ইত্যাদি বিজাতীয়, ন্যক্কারজনক কাণ্ডকারখানার বিরুদ্ধে কলম ধরতে গিয়ে এত কাসুন্দি ঘাঁটার কী দরকার! আলবাত দরকার! মার্ক্সবাদী, মাওবাদীদের এই বেলেল্লাপনা যে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, কোরান বাইবেল বিতরণে বাধা না দিয়ে শুধু গীতা, হনুমান চালিশার প্রতি বিদ্বেষটিও যে রীতিমতো সুপরিকল্পিত, হিন্দু আইডেন্টিটি ধ্বংস করার বাম আব্রাহামিক আঁতাতটি যে কত 'বিজ্ঞানসম্মত' সেটি উপলব্ধি করার জন্যই এই ফ্ল্যাশব্যাক। বলশেভিক ম্যানিফেস্টোতেই যখন ইসলাম ধর্মাবলম্বী (যদিও এটিকে কোনো মতেই ধর্ম বলা যায় না, মতবাদ মাত্র) মানুষকে 'প্রোলেতারয়েত' অর্থাৎ 'সর্বহারার' মর্যাদা

ইসলামিস্টরা বাইরে থেকে হিন্দু আইডেন্টিটি ধ্বংস করে, মার্ক্সবাদীরা ভেতর থেকে। প্রথম শক্তিটিকে সহজেই শনাক্ত করা গেলেও (ইসলাম গ্রহণের সঙ্গেই নাম পদবি আরবি হয়ে যায়), মার্ক্সবাদীরা ভেতর থেকেই (হিন্দু নাম পদবি অক্ষুণ্ণ রেখে) আক্রমণ শানায়। যা অনেক বেশি বিপজ্জনক।

দেওয়া হলো, তখন থেকেই এই বাম-ইসলামিক গাঁটছড়া। অবশ্যই রণকৌশল হিসেবে। রাষ্ট্রের অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করার এই মিলিত ষড়যন্ত্র শুধু এদেশ নয়, সমগ্র বিশ্বেই বিরাজমান। সাম্প্রতিক ইউরোপ আমেরিকাতেও তা সংঘাতের জন্ম দিচ্ছে। এই মার্ক্সবাদী, মাওবাদীরাই যখন ক্ষমতায় থাকে, ইসলামের উপর ওরাই আবার চরম নির্যাতন নামিয়ে আনে। উদাহরণ চীনের উইঘুর দমন। ক্ষমতা দখলের পর ওরা ঠিক কেমন মূর্তি ধারণ করে? অরওয়েল সাহব তাঁর Animal Farm রচনাটিতেই সার সত্যটি তুলে ধরেছেন।

Every record has been destroyed or falsified, every book rewritten, every picture has been re-painted, every statue and street building has been renamed, every date has been altered. And the process is continuing day by day and minute by minute. History has stopped. Nothing exists except an endless present in which the Party is always right!

অর্থাৎ ''প্রতিটি নথি হয় ধ্বংস নয় বিকৃত, মিথ্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হলো, প্রতিটি বই পুনর্লিখিত হলো, প্রতিটি ছবিকে নতুন করে আঁকা হলো, প্রতিটি স্ট্যাচু, রাস্তা, অট্টালিকার নাম বদলে ফেলা হলো, সাল তারিখও রেহাই পেল না। এই পদ্ধতি এবং পন্থায় কোনো ছেদ পড়ল না, চলতেই থাকল। ইতিহাস অস্তিত্বহীন হলো। পড়ে রইল কেবল অনন্ত, বিরামহীন বর্তমান, যেখানে দলই শেষ কথা।''

মিল পাচ্ছেন না? সমগ্র ভারতে না পারলেও পশ্চিমবঙ্গ নামক অঙ্গরাজ্যটিতে এরা ৩৪ বছর ক্ষমতা ভোগ করেছিল। দেশের আইনকানুন, সংবিধান মেনেই এই রাজত্ব। তবু এই রাজ্যটি যে কী ভয়াবহতার সাক্ষী ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। সাঁইবাড়ি গণহত্যা, মরিচঝাঁপির হিন্দু উদ্‌বাস্তু নিধন, প্রকাশ্য দিবালোকে আনন্দমার্গী হত্যা—রাশি রাশি হত্যালীলায় ক্ষতবিক্ষত এরাজ্যের ইতিহাস। শুধু এরাজ্য নয়, মার্ক্সবাদী, মাওবাদী নকশালরা বিপ্লবের নামে সমগ্র দেশেই অজস্র নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করলে যারা লেনিন, স্তালিন, মাও, পল পট হয়ে ওঠে, নৃশংস থাবায় খুবলে নেয় বাক্‌স্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার, 'সেকুলার' গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে ক্ষমতাহীন অবস্থাতেও ওরা পবিত্র হিন্দু ধর্মগ্রন্থ গীতার উপর পা রেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। জন্মলগ্ন থেকেই এই পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। মার্ক্সবাদী, ইসলামিস্টদের মধ্যে এব্যাপারে এতটাই সাদৃশ্য যে চমকে যেতে হয়। ভিন্ন, বিরোধী আইডেনটিটি ধ্বংসের শিক্ষা ওরা শৈশব, কৈশোর থেকেই শুরু করে। ইসলামিস্টরা যা মাদ্রাসায় সম্পন্ন করে, মার্ক্সবাদীরা টার্গেট করে স্কুল কলেজের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের। মগজ ধোলাইয়ের সার্থক নমুনা হিসেবেই ঘটে যায় একের পর এক উচ্ছৃঙ্খল 'আন্দোলন'। সাম্প্রতিক কলকাতা বইমেলার ঘটনাপ্রবাহ এরই জ্বলন্ত উদাহরণ। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ তথা সংস্কৃতির উপর এই ঘৃণ্য হামলা কী ইঙ্গিত বহন করছে? সুপরিকল্পিত রণকৌশলটি ইতিমধ্যেই সংক্ষেপে বলেছি। ইসলামিস্টরা বাইরে থেকে হিন্দু আইডেন্টিটি ধ্বংস করে, মার্ক্সবাদীরা ভেতর থেকে। প্রথম শক্তিটিকে সহজেই শনাক্ত করা গেলেও (ইসলাম গ্রহণের সঙ্গেই নাম পদবি আরবি হয়ে যায়), মার্ক্সবাদীরা ভেতর থেকেই (হিন্দু নাম পদবি অক্ষুণ্ণ রেখে) আক্রমণ শানায়। যা অনেক বেশি বিপজ্জনক। বহিঃশত্রু কাঠঠোকরা নয়, ভেতরের উইপোকাই বৃক্ষের পক্ষে বেশি বিপজ্জনক, এই সত্যটি অনুভূত হচ্ছে বলেই ওরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। কেবল হিন্দু আইডেন্টিটি নয়, সমগ্র দেশ জুড়ে জাতীয়তাবাদের যে ঢেউ সঞ্চার হয়েছে তা 'আন্তর্জাতিক' মার্ক্সবাদী, জিহাদিদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরায় নির্মূল হয়ে যাওয়া, দিকে দিকে জামানত জব্দ হওয়ার করুণ চিত্র, কেন্দ্রে জাতীয়তাবাদী দলের উত্থান মার্ক্সবাদী মাওবাদীদের কেবল বেপরোয়াই করেনি, যুগপৎ অসহায়ও করে তুলেছে। কলকাতা বইমেলার গুণ্ডামো এই অসহায়, বেপরোয়া, দিকভ্রান্ত প্রেক্ষাপটটিকেই সূচিত করে। মেলার প্রথম দিন থেকেই সংশোধিত নাগরিক

কলকাতা বইমেলায় জনবার্তার স্টলের সামনে বামপন্থীদের মারমুখী বিক্ষোভ।

আইন বিরোধী মিছিল, মিটিং, প্লেকার্ড, সই সংগ্রহ অভিযান করেও সাড়া তো দূরের কথা, জনবিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়াল বাস্তবতাটিই বারবার সামনে চলে আসছিল। সেই হতাশা থেকেই এই আক্রমণ। যা ওদের আরও বিচ্ছিন্ন, ঘৃণ্য করে তুলেছে। মেলায় আগত সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া তেমনই।

কিন্তু কোরান, বাইবেল নয় কেন? শুধুই গীতা, হনুমান চালিশা কেন? ওই যে রণকৌশল! বাম-আব্রাহামিক আঁতাত। বাম-ইসলামিক আঁতাত। যার একটিমাত্র উদ্দেশ্য—হিন্দু আইডেন্টিটির বিনাশ। কিন্তু ওরা কি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়নি? ইলামিস্টদের মন জুগিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের স্বপ্ন যদি উল্টোদিকে বাঁক নেয়? মানে ইসলামিস্টরাই যদি রাষ্ট্রের দখল নেয়? যা অনেক বেশি বাস্তব! সেক্ষেত্রে কী পরিণাম দাঁড়াবে? ইসলামি বিশ্বে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নামে কোনো বস্তু আছে? আসুন, হিন্দু আইডেন্টিটির শত্রু এই মার্ক্সবাদী মাওবাদীদের সেই চূড়ান্ত বাস্তবতাটি রূপক আকারে মনে করিয়ে দিই ঃ

একটি সরোবরে পদ্ম অথবা শাপলার সঙ্গে কচুরিপানাও থাকতে পারে। কিন্তু সে প্রারম্ভিক অবস্থায়। সমস্ত জলাশয়টিই যে একদিন কচুরি পানার দখলে চলে যাবে, সেটা কম বেশি সবাই জানে। কারণ কচুরিপানার বৃদ্ধির হার পদ্ম কিম্বা শাপলার থেকে তো বটেই অন্য যে কোনো উদ্ভিদের চেয়ে সহস্র গুণ বেশি। এটা বুঝেই লোভী শাপলার দল কচুরিপানার সঙ্গে হাত মেলায়। বাবা বাছা করে জলও ছেড়ে দেয়। উদ্দেশ্য একটাই কচুরিপানার সঙ্গে আত্মীয়তা করে পুকুরের দখল নেওয়া। তারপর পালের গোদা হয়ে বসা। শাপলা বলে কথা! অনেক উৎকৃষ্ট। কচুরিপানার দল ওদের মাথায় করে রাখবে। ওরা ভুলে যায় কচুরিপানার দখলে চলে যাওয়া জলাশয়ে শাপলা তো দূরের কথা সামান্য পানিফলও বাঁচে না।

সত্তর বছরে বিপ্লবীর হৃদয় থেকে পায়ে নেমেছে গীতা

দেবতনু ভট্টাচার্য

কলকাতার বইমেলা আর লেখক-পাঠকের গেট টুগেদারের জায়গা রইলো না। কিছু বামপন্থী তথাকথিত বিপ্লবীর দৌরাত্ম্যে ঐতিহ্যবাহী, প্রচণ্ড রকম সমৃদ্ধ একটা অ্যাকাডেমিক মঞ্চ পরিণত হলো রাজনৈতিক গুন্ডামির আখড়ায়। নিজেদের মতাদর্শের প্রচার অথবা কোনো বিষয়ের প্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ রাজনৈতিক স্লোগান, মিছিল, প্রচারপুস্তিকা বিতরণ, স্বাক্ষর সংগ্রহ—এইসব গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে হলেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু বামপন্থার কল্যাণে 'ভদ্রলোকের রাজনীতি' তো এই বাঙ্গলায় অনেক আগেই লাটে উঠে গেছে, তাই বিরোধী বিচারধারার স্টলে ঢুকে ভাঙচুর করা, আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা, বিরোধীদের শারীরিক ভাবে নিগ্রহ করা এইসব চিরাচরিত বামপন্থী পদ্ধতিতে বিপ্লব সংঘটিত হলো এবারের বইমেলায়। অসহিষ্ণুতারও একটা সীমা থাকে। সমস্ত সীমা অতিক্রম করে জনৈক বিপ্লবী শ্রীমদ্ভগবত গীতার উপরে পা রেখে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন তাদের এই বিপ্লবের স্বরূপটা কী এবং এই বিপ্লব আসলে কাদের বিরুদ্ধে। রাজ্যবাসী অবাক হয়ে দেখল—এ কোন বিপ্লব। অগ্নিযুগে বিপ্লব হতো গীতা বুকে নিয়ে, আজ বামপন্থীদের বিপ্লব হচ্ছে গীতার উপরে পা রেখে।

আসলে বামপন্থা বাঙ্গালিকে শেখাতে পেরেছে হিন্দুর ধর্ম এবং সংস্কৃতির অপমান করলে তোমার উদারতা প্রমাণিত হবে, তুমি সেকুলার এবং লিবেরাল বলে সমাজে পরিচিত হবে। এই সেকুলার আর লিবেরাল পরিচয়ই বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবী হওয়ার প্রধান শর্ত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সংকীর্ণ ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে সেকুলার আর লিবেরাল হওয়াই যদি বিপ্লবীদের আন্তরিক ইচ্ছা হয়, তবে কাছেই তো ইসলামিক ধর্মীয় সাহিত্যের প্রচারের স্টল ছিল আর সেখানে অসংখ্য কোরান ছিল তাকে সাজানো। তাহলে সেকুলার বিপ্লবীদের দৃষ্টি সেদিকে পড়লো না কেন? নিজেদের সেকুলার এবং লিবেরাল প্রমাণ করে ইন্টেলেকচুয়াল হওয়ার জন্য ওরা গীতায় পা রাখতে পারে, কিন্তু কোরানে পারে না। ওরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে গোমাংস খেতে পারে কিন্তু শুয়োরের মাংস খেতে পারে না। এরা ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের মৃগী রোগ ছিল কিংবা বিবেকানন্দ চাকরি না পেয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন—একথা বলতে পারলেও হজরত মহম্মদ মাত্র ন'বছরের আয়েষাকে কোন আক্কেলে বিয়ে করেছিল সেই প্রশ্ন করতে পারে না। কেন এই দ্বিচারিতা? হিন্দু সমাজ প্রতিক্রিয়াশীল নয় বলে? 'কৌম খতরে মে হ্যায়' বলে এক কোপে গলা নামিয়ে দেয় না বলে? এটা অবশ্যই একটা কারণ। নরম মাটিতে আঁচড় কাটা সহজ। কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ নয়। এর কারণটা অনেক গভীরে। আসলে এই বামপন্থী বিপ্লব হলো স্থানীয় সংস্কৃতি, পরম্পরা, মূল্যবোধ–সবকিছু ধ্বংস করার একটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। পৃথিবীর যেখানে এরা গেছে, সেখানে প্রথমেই এই কাজ করেছে এরা। ভারতে এখন এরা মোটেই ধর্মনিরপেক্ষ নয়, এমনকী ধর্ম-বিরোধীও নয়। এখানে এরা সরাসরি হিন্দু-বিরোধী। হিন্দুত্বকে ধ্বংস করাই এদের মূল লক্ষ্য। কমিউনিজম ও ইসলামের বেসিকস্ একই। আক্কেল আলি নামের বাংলাদেশের একজন কথাসাহিত্যিক এক জায়গায় এদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—'কমিউনিজম হলো পরিশীলিত ইসলাম'। যতদিন পর্যন্ত হিন্দুর কোমর না ভাঙা যাচ্ছে, ভারতে এদের মধ্যে একটা স্ট্র্যাটিজিক অ্যালায়েন্স থাকবে।

বইমেলায় যে ঘটনা ঘটল তা মোটেই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর পিছনে একটা মতাদর্শ আছে, যার নাম কমিউনিজম। এই মতাদর্শ বাইরে থেকে মনমোহিনী, কিন্তু আসলে সম্পূর্ণ অবাস্তব কল্পনা। এই মতাদর্শ পৃথিবীতে কোথাও সফল হয়নি, হবেও না। বরং শনির দৃষ্টির মতো যেখানে যেখানে এর দৃষ্টি পড়েছে, বিনাশ আর ধ্বংস ছাড়া সেখানে আর কিছুই ঘটেনি। সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে এরা একটা স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে যেখানে একটাই রাজনৈতিক দল (কমিউনিস্ট পার্টি) থাকবে, অন্য কোনোও বিরোধী দল অথবা মতাদর্শের কোনোও স্থান থাকবে না। এমনকী সংবাদমাধ্যমও থাকবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে। এই চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক এবং অসহিষ্ণু শাসন যেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মানবতা হয়েছে অসহায় এবং লজ্জিত। রাশিয়া, চীন, কম্বোডিয়া, উত্তর কোরিয়া-সহ সর্বত্র মানবতা হয়েছে ধর্ষিত। লেনিন, স্তালিন, মাওয়ের নেতৃত্বে দমনপীড়ন, হত্যালীলার কথা আজ বহুল প্রচারিত বলে এখানে আলোচনা করছি না। পল পটের নেতৃত্বে শুধু কম্বোডিয়াতেই ২৫ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল এই 'সর্বহারার মসিহা' কমিউনিস্ট শাসকরা। 'The Black Book of Communism' গ্রন্থের সহ-লেখক Rigoulot-এর গবেষণা অনুসারে উত্তর কোরিয়ায় কমিউনিস্ট শাসনকালে প্রায় এক লক্ষ লোককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, ১৫ লক্ষ লোককে উত্তর কোরিয়ার গুলাগে হত্যা করা হয়েছে এবং দুর্ভিক্ষে মারা গেছে ৫ লক্ষ লোক। এই পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরের শাসনকালে আমরা মরিচঝাঁপি, বিজনসেতু, সাঁইবাড়ির মতো কত ঘটনাই না দেখেছি। খুন, ধর্ষণ, নির্যাতনে লালশাসনের ৩৪ বছরের ট্র্যাক রেকর্ড মোটেই খারাপ নয়। তবে সেগুলোর পিছনে ছিল নিখুঁত এবং দূরদর্শী পরিকল্পনা। এই নির্যাতনের ক্ষেত্রে

বামৈস্লামিক আঁতাতের বিষয়টাও (পাকিস্তানের দাবিকে সমর্থনের কথা ছাড়াও) অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার। ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পরে বামফ্রন্টের একজন মন্ত্রী চৌরঙ্গি-ধর্মতলা চত্বরে বিহারি মুসলমানদের হকার হিসেবে বসিয়ে দিলেন। এই মুসলমানরা আসলে ছিল পূর্ব-পাকিস্তানের রাজাকার। এরা সেখানে হিন্দুদের গণহত্যায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে এরা পাকিস্তানে যেতে চাইলে পাকিস্তান এদের নিতে অস্বীকার করে। তখন এরা সীমানা পেরিয়ে ভারতে ঢোকে এবং খোদ কলকাতায় ঘাঁটি গেড়ে বসে পড়ে বামফ্রন্টের সেই মন্ত্রীর ছত্রছায়ায়। ১৯৮৪ সালে বন্দর এলাকায় আইপিএস বিনোদ মেহেতাকে নৃশংসভাবে খুন করা হয় এবং এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গেও সেই মন্ত্রী জড়িত ছিলেন এটা একটা ওপেন সিক্রেট। ৩০ মে, ১৯৯০ সাল। বাসন্তী হাইওয়ের উপরে অবস্থিত বানতলায় সিপিআই(এম) অফিসের কাছেই উমা ঘোষ, রেণু ঘোষ এবং অনিতা দেওয়ানকে ধর্ষণ করে খুন করে মুসলমান দুষ্কৃতীরা। তাঁরা ছিলেন রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দফতরের কর্মী। তাদের অপরাধ, তারা মুসলমান মহিলাদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার প্রচার করছিলেন। প্রতিক্রিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু বললেন—'ওরকম তো হয়েই থাকে।' ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩। নদীয়া জেলায় ধানতলা। কয়েকজন লুঙ্গিধারী কমরেড বরযাত্রীর গাড়ি থেকে নামিয়ে ধর্ষণ করল হিন্দু মেয়েদের। এই রকম বিরাটি, কুচবিহারের ঘোকসাডাঙা, রূপনগর-তারানগরের মতো অসংখ্য জায়গায় ছড়িয়ে আছে লালঝান্ডার আশ্রয় নিয়ে শান্তির দূতদের দৌরাত্ম্যের নিদর্শন। শুনেছি জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বিজেপি-র একটি প্রতিনিধিদল তাঁর সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তখন জ্যোতিবাবু এদিক ওদিক, টেবিলের তলায়, চেয়ারের তলায় উঁকিঝুঁকি মেরে নাটকীয় ভঙ্গিতে সেই প্রতিনিধিদলকে বলেন—কই, অনুপ্রবেশকারীদের দেখতে পাচ্ছি না তো। এভাবেই বামেরা ইসলামের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হিন্দুর সর্বনাশ করার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে স্থায়ীভাবে দুর্বল করে দিয়ে গেছে। এছাড়া শিল্প, বাণিজ্য, কর্মসংস্থান ইত্যাদির কথা বহুচর্চিত বলে সেবিষয়ে লিখে পাঠকের সময় নষ্ট করতে চাই না। শুধু এটুকুই বলবো ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সময় তারা এরাজ্যে ছাপ্পান্ন হাজার বন্ধ কল-কারখানা এবং এক কোটি বেকার রেখে গেছে।

বামপন্থীরা কী করেছে আর কী করতে চায়, সেটা বোঝানোর জন্যই এই তথ্যগুলো তুলে ধরা। আর বইমেলার ঘটনার পিছনে যারা আছে তারা তো আবার বামপন্থীদের মধ্যে বাম, তাই তারা অতিবাম। এরা সত্তেরের দশকে কী করেছিল এই রাজ্যে? এরা 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, চীনের পথ আমাদের পথ' স্লোগান তুলে বিপ্লব করেছে। 'পুলিশ মারো, অস্ত্র কাড়ো' বলে নিরাপরাধ পুলিশকর্মীদের খুন করেছে। 'বুর্জোয়া প্রথায় যে যত পড়িবে, সে তত মূর্খ হইবে' আর 'স্কুল শিক্ষকরা বুর্জোয়া শিক্ষা দেয়' বলে স্কুল শিক্ষকদের খুন করেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপাল সেন এই খুন হয়ে যাওয়া শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম। এরা ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা হেমন্ত বসুকে খুন করেছে, বরানগরের জনপ্রিয় কংগ্রেস নেতা নির্মল চ্যাটার্জিকে খুন করেছে। এদের এই কল্পিত বিপ্লবের নেশায় বুঁদ হয়ে সেই সময়কার কত যে প্রতিভাবান বাঙ্গালি যুবক মরীচিকার পিছনে ছুটতে ছুটতে হারিয়ে গেছে তার হিসাব কে রেখেছে। তবে এই বিপ্লবের পরিণাম খুবই হতাশাজনক। বরানগরে নির্মল চ্যাটার্জিকে খুন করার পরে স্থানীয় জনগণ একেবারে ক্ষেপে ওঠে। পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে কাশীপুর বরানগর এলাকার সাধারণ মানুষ রাস্তায় নামে এবং নকশাল বলে পরিচিত শতাধিক ছেলেকে ঘর থেকে টেনে বের করে নির্বিচারে খুন করে। এই ধরনের প্রতিক্রিয়া আরও কিছু জায়গায় শুরু হতেই বিপ্লবের আগুন ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বিপ্লবী আঁতলামো ছেড়ে নেতারা গা ঢাকা দেয়, অনেকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। যারা পারেনি তারা মারা পড়ে। চারু মজুমদার ধরা পড়ে এবং পুলিশ কাস্টডিতেই তাঁর মৃত্যু হয়। চারু মজুমদারের মৃত্যুর পরে পশ্চিমবঙ্গে নকশাল আন্দোলনের ইতি হয়। সেই সময় এই তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধাদের হতাশার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে একটা দেওয়াল লিখন বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল—

'শুয়োরের বাচ্চা জনগণ
রইল তোদের আন্দোলন
চললাম আমরা বৃন্দাবন'

এই দায়িত্বহীন, ক্ষণস্থায়ী জঙ্গিপনার পথে যারা অতিবামপন্থী বিপ্লব করতে চাইছে, তাদের সেই বিপ্লবের করুণ পরিণতির কথা স্মরণে রাখা উচিত। এই বিপ্লবের কোনোও শক্তপোক্ত ভিত সেদিনও ছিল না, আজও নেই। আঠারো বছর বয়সের অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়তা আর বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য আছে। এই নব্য নকশালদের কাছে বিপ্লব তাদের জীবনের ব্রত নয়, এ হলো বিপ্লবের নামে ক্ষণিকের অর্গ্যাজম। তবে দিনকাল বদলে গেছে। একটা সীমা পর্যন্ত জনগণ এই সব কাজকর্ম ছেলেমানুষি মনে করে ক্ষমা করে দেবে। কিন্তু সেই সীমা অতিক্রম করলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে এবং সেটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা হবে। আজ ভাঙার সময় নয়, গড়ার সময়। যুব-ছাত্র সমাজকে সময়ের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশ ও জাতিকে শক্তি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

(লেখক হিন্দু সংহতির সভাপতি)

‘আর এস এসের চামড়া গুটিয়ে দেব আমরা’

এবারের বইমেলায় কয়েকটি অতি বাম সংগঠন পরিকল্পিতভাবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্টলে হামলা করেছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সিএএ-বিরোধী আন্দোলনের নামে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও ভারতীয় জনবার্তার স্টল লণ্ডভণ্ড করা এবং হিন্দুদের মনে ভীতির উদ্রেক করা। বাম সংগঠনের কর্মীরা স্টলের বইপত্র তছনছ করে স্লোগান দেয়, ‘আর এস এসের চামড়া গুটিয়ে দেব’ আমরা। হাঙ্গামার সময় স্টলে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রদেশ ধর্মাচার্য সম্পর্ক প্রমুখ শ্রীবিশ্বজিৎ দাস। স্বস্তিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি সেদিনকার ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন।

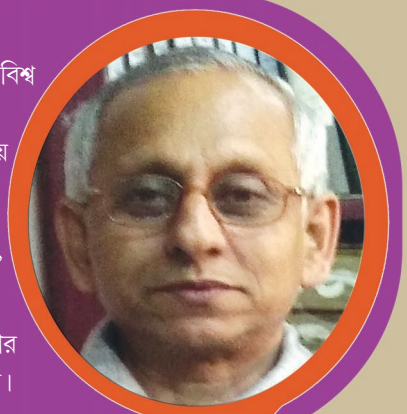

স্বস্তিকা : গীতায় পা রেখে যখন বিক্ষোভ চলছিল তখন কি আপনি স্টলে ছিলেন?

বিশ্বজিৎ : আমি তখন স্টলের কাউন্টারে বসে। স্টলের বাইরে হনুমান চালিশা বিতরণ করা হচ্ছিল। হঠাৎ খবর পেলাম এস এফ আই এবং কয়েকটা নকশাল সংগঠনের কর্মীরা হনুমান চালিশা নিয়ে পা দিয়ে দলাদলি করছে। সেইসময় স্টলে যেসব ক্রেতা ছিলেন, দেখলাম তারাই বাইরে গিয়ে এই ঘটনার প্রতিবাদ করলেন। এস এফ আইয়ের ছেলেরা ভেতরে ঢুকে স্টলের জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলতে শুরু করে। আবার দেখলাম স্টলে উপস্থিত ক্রেতারা, যাদের মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা, তারা রুখে দাঁড়ালেন। শুধু তাই নয়, এস এফ আইয়ের ছেলেদের প্রতিহতও করলেন।

স্বস্তিকা : ওরা কী ধরনের স্লোগান দিচ্ছিল?

বিশ্বজিৎ : যারা স্টলের ভেতরে ছিল, তারা বলছিল, ‘নরেন্দ্র মোদী নিপাত যাক, সিএএ মানছি না, মানব না।’ স্টলের বাইরে চলছিল অন্য স্লোগান, ‘আর এস এসের চামড়া গুটিয়ে দেব আমরা।’ যা শুনে ক্রেতারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলেন, কীরকম স্পর্ধা দেখেছ! এরা কি রাজনীতি করার জন্য প্রতি বছর বইমেলায় আসে? আমি তখন ওদের বললাম, প্রতিবছরই ওরা আমাদের স্টলের সামনে কোনো না কোনো ইস্যু তুলে গণ্ডগোল পাকায়। পুলিশ বা প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো লাভ হয় না। আমিই ওদের ঠেকিয়ে রাখি। যাতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয়। কারণ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জন্য মেলায় কোনো বিশৃঙ্খলা হলে পরের বছর আমরা স্টল পাব না। আমরা গিল্ডের সঙ্গে কোনো বিবাদে যেতে চাই না।

স্বস্তিকা : বইমেলায় আপনারা কতবছর স্টল দিচ্ছেন?

বিশ্বজিৎ : এবার নিয়ে দশ বছর হলো

স্বস্তিকা : আপনি বলছেন পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়ে কোনো লাভ হয় না। আপনারা কি কখনও পুলিশকে এসব জানিয়েছেন?

বিশ্বজিৎ : না, আমরা কোনো বিবাদে যেতে চাই না।

স্বস্তিকা : হনুমান চালিশা বিতরণ বন্ধ করা হলো কেন?

বিশ্বজিৎ : বাম সংগঠনের ছেলেরা হনুমান চালিশা বিতরণে বাধা দেওয়ার পরদিন পুলিশের পক্ষ থেকে আমাদের জানানো হলো, হনুমান চালিশা বিতরণ করা যাবে না। আমরা বলি, মেলার বাইরে বাইবেল কোরান বিতরণ করা হচ্ছে, সে ব্যাপারে আপনারা কিছু বলছেন না অথচ হনুমান চালিশা বিতরণে বাধা দিচ্ছেন। এটা কেন? যে পুলিশ অফিসার দায়িত্বে ছিলেন তিনি স্পষ্ট বলেন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ প্রশাসনের নির্দেশ না মানলে স্টল বন্ধ করে দেওয়া হবে।

স্বস্তিকা : গীতায় পা রেখে প্রতিবাদের সময় আপনি কোথায় ছিলেন?

বিশ্বজিৎ : স্টলেই ছিলাম। ঋক ধর্মপাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি গীতায় পা রেখে দাঁড়িয়ে এনআরসি-বিরোধী স্লোগান দিচ্ছিল। শুনেছি পরে এই ব্যক্তিই বিধাননগর থানায় ঢুকে মহিলা পুলিশ কর্মীকে মারধর করে।

স্বস্তিকা : আপনারা গিল্ডকেও কিছু জানাননি?

বিশ্বজিৎ : আমরা চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু গিল্ড সেই চিঠি নেয়নি।

দক্ষিণবঙ্গ সংস্কার ভারতীর বিকাশ ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা

গত ৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতার মানিকতলা স্থিত রামমোহন হলে মাঘীপূর্ণিমার সন্ধ্যায় সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে আয়োজিত হয় 'বিকাশ ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা'। ভাব সংগীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক

রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্থার সংস্থাপক সদস্য সুভাষ ভট্টাচার্য এবং এক সময় সাহানা নামে খ্যাত যাত্রাভিনেত্রী মীরা ভট্টাচার্য। সম্মাননীয় অতিথিদের বরণ করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী মীরা ভট্টাচার্যকে যাত্রাজগতে তাঁর অবদানের জন্য সম্মানিত করা হয়। উল্লেখ্য, শ্রীমতী ভট্টাচার্য সংস্থার দেশবন্ধু শাখার সদস্য এবং তিনি অতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা সংবর্ধিত হয়েছেন।

সুভাষ ভট্টাচার্য তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে জানান সংস্কার ভারতী এতদিন বিকাশ ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে মাঘীপূর্ণিমার দিন 'বিধায়ক ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা'-র আয়োজন করে এসেছে। তাতে নাট্যজগতের বহু বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন। সেই শৃঙ্খলায় এবছর থেকে সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত মাঘীপূর্ণিমার দিনটিতে যিনি আমৃত্যু সংস্থার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ছিলেন সদ্যপ্রয়াত সেই বিকাশ ভট্টাচার্যের নামে এই স্মারক বক্তৃতা শুরু করল এবং আগামীদিনে শুধু নাট্যজগতের নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল যে কোনো ব্যক্তিত্ব তিনি সংগীত-সাহিত্য-নৃত্য-সংবাদ ইত্যাদি যেকোনো ক্ষেত্রের হতে পারেন সংস্কার ভারতী তাঁদের বক্তব্য রাখবার জন্য আহ্বান জানাবে। কারণ সংস্কার ভারতীর সৃষ্টিই হয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতির মনন, অনুসরণ, চিন্তন ও চর্চার মাধ্যমে প্রসারণের জন্য। তাই আগামী প্রজন্মের সামনে জাতীয়তাবাদের কথা, আধ্যাত্মিকতার কথা, শৃঙ্খলাপরায়ণতার কথা তুলে ধরার জন্য সংস্কার ভারতী কাজ করে যাবে। অনুষ্ঠানের মুখ্য বক্তা রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সংস্কার ভারতী জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক কর্মের মাধ্যমে সারা ভারতবর্ষের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ কারার কাজে নিয়োজিত। এই মহতী কর্মে বিকাশ ভট্টাচার্য অমৃত্যু নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে কিশোর বয়স থেকে তাঁর শ্রীভট্টাচার্যের সঙ্গে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী কাজের সঙ্গী হবার কথা উল্লেখ করেন। পশ্চিমবঙ্গে সংস্কার ভারতী প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পর থেকেই শ্রীভট্টাচার্য সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হন এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি নাট্যবিভাগেরও দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন এবং পশ্চিমবঙ্গের নাট্যজগতে বামপন্থী প্রভাবকে অতিক্রম করে সংস্কার ভারতীর নাট্যবিভাগকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বর্তমান প্রজন্মকে তাই দায়িত্ব নিয়ে সেই কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। প্রতিকূলতার মধ্যেও ভারতীয়ত্বকে তুলে ধরে বিদেশি ভাবধারাকে উপেক্ষা করে ভারতীয় ভাবধারা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তবেই বিকাশ ভট্টাচার্যকে সঠিক মর্যাদা দেওয়া হবে। এর পর তিনি ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

সমাপ্তি পর্বে পাঁচটি নাটকের গান পরিবেশন করেন বাঁশদ্রোণী, বেহালা, দেশবন্ধুনগর, উত্তর কলকাতা ও বাগুইআটি শাখার শিল্পীরা। তাঁরা যথাক্রম সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, প্রায়শ্চিত্ত, নূরজাহান ও বিদ্যাসুন্দরপালা নাটকের গান মঞ্চস্থ করেন। পরে ছিল দুটি শ্রুতিনাটক। প্রথমটি বনফুলের কাহিনি অবলম্বনে 'চিঠি'। নাটক ও নির্দেশনা অমিত দে। দ্বিতীয়টি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা অবলম্বনে 'চিরসখা'। নাটক শেখর দাশগুপ্ত ও পরিচালনায় অলোক বল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সুকুমার পতি।

মালদা গৌড় মহাবিদ্যালয়ে ‘সাহিত্য ভারতী’ দেওয়াল পত্রিকার উন্মোচন

মালদা গৌড় মহাবিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগের উদ্যোগে ‘সাহিত্য ভারতী’ দেওয়াল পত্রিকার উন্মোচন এবং ‘সংস্কৃতে বিজ্ঞান’ বিষয়ক চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। দেওয়াল পত্রিকার মাধ্যমে মালদার গম্ভীরা গান ও জেলার প্রধান ফসল আমকে তুলে ধরা হয়েছে। পত্রিকার সম্পাদনা করেন কলেজের বিভাগীয় অধ্যাপক মানিক হালদার এবং উন্মোচন করেন রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক নিরঞ্জন মৃধা। প্রদর্শনীতে জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষ, গণিত, যোগশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় যা সংস্কৃতে রয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে।

বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক বিজয় ঘোষ, অধ্যাপিকা তানভি পারভিন, অধ্যাপক প্রভাকর সাহা,অধ্যাপক প্রলয় কুণ্ডু,অধ্যাপক ঋষি ঘোষ প্রমুখ।

খড়কুশমা আশ্রমে ভারতমাতা পূজা

প্রতি বছরের মতো এবছরও শুভ মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় খড়কুশমা উত্তমানন্দ ভজন কুটির আশ্রমে ৩৭ তম বর্ষিক মাঘীপূর্ণিমা উৎসব এবং খড়কুশমা উত্তমানন্দ শাখার ভারতমাতা পূজা সম্পন্ন হয়। সেদিন সকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে উৎসবের শুভারম্ভ করেন ডুমুরদহ উত্তমাশ্রমের আচার্যদেব স্বামী অভয়ানন্দ মহারাজ জীউ। উৎসবে পনেরো হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করে দুপুরে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

আলিপুরদুয়ারে বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের জেলা সম্মেলন

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ অনুমোদিত বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের আলিপুরদুয়ার জেলা সমিতির প্রথম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গত ৯ ফেব্রুয়ারি গুরুদয়াল জয়সুন্দর সারদা

শিশুতীর্থে। সম্মেলনে জেলার ৮০ জন শিক্ষক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সমিতির সদস্য নিশীথ বিশ্বাস। সম্মেলনে নতুন জেলা সমিতি গঠিত হয়। সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত হন যথাক্রমে বাসুদেব দত্ত, সুমন্ত সিংহ ও প্রান্তিক দে।

কেশব ভবনে পরিবার প্রবোধনের প্রাদেশিক বৈঠক

গত ৮-৯ ফেব্রুয়ারি পরিবার প্রবোধন উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের প্রাদেশিক বৈঠক সম্পন্ন হয় কলকাতার কেশব ভবনে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অখিল ভারতীয় সহ সংযোজক রবীন্দ্র যোশী, দুই প্রান্তের সংযোজক স্বামী পরমানন্দজী মহারাজ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল বিশ্বাস। বৈঠকে দুই বঙ্গের ৩৬ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে

চন্দ্রচূড় গোস্বামী

‘ দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে, ত্রিভুবন তারিনি তরল তরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিবিহারিনি বিমলে, মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে’।।

পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে অযোধ্যার রঘুবংশীয় মহাপ্রতাপশালী মহারাজ ভগীরথ কপিলমুনির অভিশাপ থেকে তাঁর পূর্বপুরুষদের মোক্ষপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবতরণের জন্য আহ্বান করবেন বলে মনস্থ করলেন। এই অভিলাশা উদ্দেশ্যে বিষ্ণুদেবের কঠিন তপস্যা করেন। বিষ্ণুদেব তপে সন্তুষ্ট হয়ে গঙ্গাকে মর্ত্যে গমনের জন্য উপদেশ দিলেন। কিন্তু সমস্যা হলো গঙ্গার গতিবেগ এতটাই প্রবল যে তা ধারণের ক্ষমতা জীবধাত্রী বসুধার ছিল না। প্রলয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। তখন বিষ্ণুদেবের অনুরোধেই দেবাদিদেব মহাদেব গঙ্গাকে নিজ মস্তকে ধারণ করে গঙ্গার গতি নিয়ন্ত্রণ করলেন। তারপর শিবজটা থেকে এক সরু জলধারা হিসেবে গঙ্গা মর্ত্যে নেমে এলেন। স্থানটা হলো হিমালয়ের গঙ্গোত্রি হিমবাহের গোমুখ অঞ্চল। তারপর গঙ্গা মহারাজ ভগীরথকে অনুসরণ করে প্রায় ২৫২৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে অবশেষে কপিল মুনির আশ্রমের কাছে সাগরে এসে মিলিত হলেন। যা আজ গঙ্গাসাগর নামে পরিচিত। মহারাজ ভগীরথের পূর্বপুরুষরা গঙ্গার পুণ্যস্পর্শে মুক্তি পেয়ে মোক্ষলাভ করল। এ তো গেল পৌরাণিক কাহিনি। ইতিহাসেও গঙ্গাকে নিয়ে অনেক বিচিত্র ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। সালটা ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ। মহারানি ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর তার পুত্র সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক কালে সারা পৃথিবীর খ্যাতনামা রাজা-মহারাজদের আপ্যায়ন করা হয়। আমন্ত্রিত ছিলেন জয়পুরের মহারাজ দ্বিতীয় মাধো সিংহ। কিন্তু সমস্যা হলো সে যুগে এক নিষ্ঠাবান হিন্দু রাজার পক্ষে কালাপানি পাড়ি দেওয়া শাস্ত্রসম্মত ছিল না। অগত্যা মহারাজ মাধো সিংহ নিজের ধর্ম ও কুল রক্ষার্থে তিনটি অতিকায় রৌপ্য কলস নির্মাণ করে তাতে গঙ্গাজল নিয়ে জাহাজে করে (S. S. Olympia) ইংল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হলেন। কলসগুলি গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড স্বীকৃত পৃথিবীর বৃহত্তম রৌপ্য নির্মিত কলস বা ঘড়া। এগুলির প্রতিটির উচ্চতা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি, ব্যাস ১৫ ফুট, ওজন ৩৫৭ কিলোগ্রাম এবং প্রতিটিতে ৯০০০ লিটার করে জল ধরে। কথিত আছে, মহারাজ মাধো সিংহ ইংল্যান্ড যাত্রা থেকে দেশে ফিরে আসা পর্যন্ত দীর্ঘ তিনমাস ওই বিশুদ্ধ গঙ্গাজল পান করেছিলেন এবং গঙ্গাজলে স্নান করেই ধর্ম ও কুলমর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। ওই বিশ্ববিখ্যাত রৌপ্য কলসগুলির মধ্যে দুটি আজও জয়পুরের মানসিংহ প্যালেস মিউজিয়ামে (Sowai Man Singh City Place Museum) প্রদর্শনের জন্য রাখা আছে।

গঙ্গানদীর এইসব ঐতিহাসিক ও পুরাণাশ্রিত ঘটনাবলী যেমন চিত্তাকর্ষক, সেই রকম আধুনিক বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে গঙ্গানদীর আলৌকিক গুণাবলী সমান ভাবে সমাদৃত এবং বিজ্ঞানীদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। আধুনিক বিজ্ঞান একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে গঙ্গানদীর জলে এমন কিছু গুণ রয়েছে যা পৃথিবীর আর অন্য কোনো জল, জলাধার বা জলের উৎসে নেই। গঙ্গাজলে রয়েছে স্ব-পরিশোধিত ক্ষমতা (Self Cleaning Property) । গঙ্গাজলের এই অভাবনীয় ক্ষমতা ও জীবাণুনাশক গুণ প্রথম আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন বিখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী E. Hangry Hankin, 1896 খ্রিস্টাব্দে। তিনি একটি পাত্রে

বিশুদ্ধ জল নিয়ে তাতে প্রচুর পরিমাণে কলেরা রোগের ব্যাক্টেরিয়া 'ভিব্রিও কলেরি' (Vibrio Cholerae) মিশিয়ে দিলেন। অন্যদিকে অন্য অকটি পাত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ গঙ্গাজল নিয়ে তাতেও সম পরিমাপ কলেরার ব্যাক্টেরিয়া মিশিয়ে দিলেন। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন গঙ্গাজলে মেশানো সব ব্যাকটেরিয়া মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যেই মরে গিয়েছে। অথচ বিশুদ্ধ সাধারণ জলে দুদিন পরেও ব্যাক্টেরিয়াগুলি বহাল তবিয়তে বেঁচে রয়েছে এবং 'বাইনারি ফিসন' (Binary Fission) পদ্ধতিতে তাদের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে।

এইরকম অনুরূপ আরেকটি ঘটনার সাক্ষী বিখ্যাত ফরাসি বিজ্ঞানী ফিলিক্স। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি গঙ্গাজলে কলেরা বা আমাশয় রোগে মৃত কয়েকটি দেহ ভাসতে দেখেন। পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন মৃতদেহগুলির এক ফুট নীচেও যেখানে কোটি কোটি জীবাণুর উপস্থিতি স্বাভাবিক ছিল, সেখানে একটিও জীবাণু নেই। গঙ্গাজলের এই গুণের জন্যই হয়তো আজ পর্যন্ত কোনোদিন গঙ্গানদীর প্লাবনের ফলে কোনো মহামারী হয়নি। এমনকী, বদ্ধ পাত্রে রাখা উন্মুক্ত গঙ্গাজলে মশার লার্ভা বা অন্যকোনো কীটাণুর লার্ভা জন্মাতে পারে না।

কিন্তু গঙ্গানদীর জলে এমন কী রয়েছে যার ফলে সমস্ত দূষিত পদার্থকে বিশুদ্ধ করার অসামান্য এই ক্ষমতা? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানী ফিলিক্স পেলেন এক অভাবনীয় তথ্য। তিনি দেখলেন গঙ্গাজলে কোনো ব্যাকটেরিয়া, রোগজীবাণু ইত্যাদি কোনো দূষিত পদার্থ যত বেশি পরিমাপেই নিক্ষেপিত হোক না কেন, 'ব্যাকটেরিয়োফাজ' (Bacteriophage) নামক এক প্রকার উপকারী ভাইরাস লক্ষকোটি সংখ্যায় উপস্থিত হয়ে 'ফাজিন' (Phagein) পদ্ধতিতে ব্যাক্টেরিয়াগুলিকে মেরে ফেলে। গঙ্গাজলের এই অলৌকিক গুণের কারণ আজ বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়। আর সেই জন্যেই ভারত সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর এবং জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য একশো পঞ্চাশ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এই প্রজেক্টে গবেষণার জন্য 'The National Environment Research Institute' এবং 'The Indian Institute of Technology, Kanpur'-এর ২০০ জন বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে নিযুক্ত করা হয়েছে। গঙ্গানদীর প্রবাহের বিভিন্ন স্থান ও গভীরতা থেকে বিজ্ঞানীরা নমুনা সংগ্রহ করে বিগত দেড়বছর ধরে গবেষণার ফলে যে তথ্যগুলি সংগ্রহ করেছেন সেগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে, গঙ্গাজলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ব্যাক্টেরিয়া ও জীবাণু নাশক 'ফাজ ভাইরাস' (Bacteriophage) । কিন্তু কোথা থেকে আসছে এই বিপুল পরিমাণ 'ফাজ ভাইরাস'? বিজ্ঞানীরা একে 'Mysterious X factor' বলে চিহ্নিত করেছেন। অনুমান করা যায় আগামীদিনে নিশ্চই এর উত্তর পাওয়া যাবে। গঙ্গাজলের এই অলৌকিক গুণকে চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যবহারের জন্যও গবেষণা চলছে। বিজ্ঞানীরা আরও আবিষ্কার করেছেন যে, গঙ্গানদীর জলে অন্য যে কোনো জলের তুলনায় ২৫ গুণ বেশি অক্সিজেন দ্রবীভূত থাকে। আর সেই জন্যেই গঙ্গাজলে ফেলে দেওয়া যে কোনো অপদ্রব্য ১৫ গুণ তাড়াতাড়ি বিশুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এর অর্থ তো এটা নয় যে আমরা যত্রতত্র, যতখুশী অপদ্রব্য ও বর্জ্য পদার্থ গঙ্গায় ফেলে দেব। কারণ প্রকৃতিরও একটি নির্দিষ্ট ধারণ ক্ষমতা রয়েছে। গঙ্গানদীও তার ব্যতিক্রম নয়। গঙ্গানদী ভারতের আস্থা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির প্রতীক। গঙ্গাদূষণ রোধ করা আমাদের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য। আর সেই জন্যই ভারত সরকার ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে 'নমামি গঙ্গে' প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই পুরো প্রকল্পে ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

একথা সহজেই অনুমেয় যে আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষিমুনিরা কয়েক হাজার বছর আগে থেকেই গঙ্গানদীর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেছেন। তাঁরা জানতেন যে গঙ্গানদীতে স্নান করতে গেলে মানুষের শরীরে অবস্থিত ব্যাক্টেরিয়া মরে যাবে এবং সবাই সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান থাকবে। কিন্তু এই বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব সবাইকে ব্যাখ্যা করে বিস্তারিত জানানো হয়তো তাঁদের যথেষ্ট শ্রমসাপেক্ষ ও অসম্ভব মনে হয়েছে। তাই হয়তো তাঁরা এই তত্ত্বকে আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সাথে জুড়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন মানুষ যাতে গঙ্গাস্নান করে ও গঙ্গাজল পান করে সুস্থ ও দীর্ঘায়ু লাভ করে। কারণ ভারতীয় দর্শন বরাবরই বিশ্বাস করে এসেছে—'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বেসন্তু নিরাময়াঃ সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ ভবেৎ'।।

পাটনায় গঙ্গার ঘাট।

নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা মহামুনি ভরত

পরম্পরা

অমিত ঘোষ দস্তিদার

রসপ্রস্থানিক এমন এক সম্প্রদায় যাঁরা রসের সর্বাতিশায়ী প্রাধান্যকে স্বীকার করেন। এই সম্প্রদায়ের পথিকৃৎ আচার্য ভরতমুনি। মহামুনি ভরত-প্রণীত 'নাট্যশাস্ত্র' মূলত নাট্যতত্ত্বের আলোচনায় সমৃদ্ধ হলেও সেখানে রস, দোষ, গুণ, অলংকার প্রভৃতি কাব্যোপাদানও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। আচার্য ভরত রসের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন---''ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে।'' তাঁর মতে রস থেকেই কাব্যের উৎপত্তি এবং রসেই কাব্যের পর্যবসান। রস বিশ্লেষণে ভরতমুনি বলেছেন--- ''বিভাবানুভাব-ব্যাভিচারি- সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ।'' আচার্য ভরত-প্রবর্তিত এই রসসূত্র উত্তরকালের আলংকারিদের দ্বারা নানাভাবে ব্যাখ্যাত হয়ে রসতত্ত্বের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হয়েছে। ভরতমুনি রসের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর আলংকারিকগণ তার যথার্থ গুরুত্ব সম্যক অনুধাবন করতে পারেননি। ভমহ, দণ্ডী, উদ্ভট, রুদ্রট প্রভৃতি আলংকারিকেরা রসের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়েও তার পরিপূর্ণ মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। নবম শতাব্দীকালে আচার্য আনন্দবর্ধন এই রসতত্ত্বকে এক বিশেষ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে শৃঙ্গার, বীর, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত—এই আট প্রকার রসের উল্লেখ আছে।

সামবেদই ভারতীয় সঙ্গীতের মূল উৎস। ঋঙ্মন্ত্রে সাতটি স্বরযোজনা করে সামগান করা হতো। গান করার সময় ঋত্বিক্‌গণ কর ও অঙ্গুলি সঞ্চালন দ্বারা বিভিন্ন স্বরের উপর জোর দিতেন। সামবেদের যুগে সপ্তস্বরের নাম ছিল—ক্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র ও অতিস্বার্য। বৈদিক শিক্ষাগ্রন্থ নারদশিক্ষার রচয়িতা নারদ এবং বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য সামবেদের সপ্তস্বরকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম নামে অভিহিত করেছেন। সামবেদের এই সপ্তস্বরই পরবর্ত্তীকালে ভারতীয় মার্গসঙ্গীতে ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ-- এই সপ্তসুরের মাধ্যমে পল্লবিত হয়ে সুবিশাল সঙ্গীতধারার সৃষ্টি করেছে। সুতরাং প্রাচীন ভারতের তপোবনে যে সামরব প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল তাই-ই ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রের আদি উৎস বলা যায়। সংগীতের সঙ্গে সংগত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সংগত

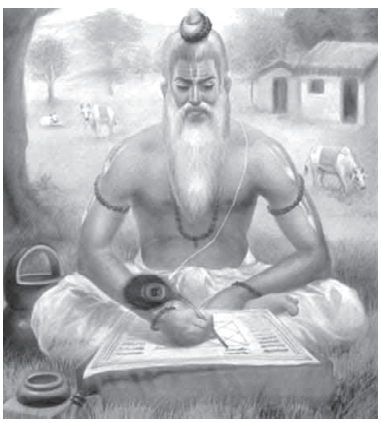

সংগীতকে এক সর্বাঙ্গসুন্দর মাত্রা দান করে। বলা হয় সিদ্ধিদাতা গণেশ মৃদঙ্গের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি মহাদেবের কাছ থেকে সংগত শিক্ষা করেন। পৌরাণিক যুগে মৃদঙ্গের সন্ধান পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে তার অস্তিত্ব ছিল। মৃদঙ্গের আকৃতি ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান হলো নাট্যশাস্ত্রের জনক ভরতমুনির কাল থেকে। সে সময়ের মৃদঙ্গ তিনরকম-- পুষ্কর, মর্দল, মুরজ। যেটি কোলে নিয়ে বাজানো হতো সেটি হরিতকী আকৃতির। মৃত্তিকা নির্মিত মৃদঙ্গ ভরতমুনির সময়ে আঙ্গিক নাম ধারণ করে এবং স্বাতীর প্রভাবে কালোমাটির গাব যুক্ত হয়ে ও ছোট্-এর টানে বাড়া-কমার ব্যবস্থা যুক্ত হয়ে সেই আঙ্গিক সপ্তকের স্বর অনুসরণে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। সংগত-সংগীত-নৃত্য ইত্যাদিতে 'তাল' শব্দের আবশ্যকতা দেখা যা। 'তাল'—তল্ (প্রতিষ্ঠিত হওয়া) ধাতুর সঙ্গে 'ঘঞ'— প্রত্যয়যোগে 'তাল' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে; অর্থাৎ গীত, বাদ্য ও নৃত্য যার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। শাস্ত্রে তাল শব্দটির ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—''তকার শঙ্করঃ প্রোক্ত ল কারঃ শক্তিরূচ্যতে। শিবশক্তি সমাযোগত্তাল নামাভিধয়তে''।। অর্থাৎ 'ত'-কার শঙ্কর বা শিব এবং 'ল'-কারে শক্তি, এই দুটি বর্ণের সংযোগে 'তাল' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। হর-গৌরীর তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্যের আদ্যক্ষরদ্বয় নিয়ে 'তাল' শব্দের সৃষ্টি হয়েছে।

মহামুনি ভরত প্রণীত 'নাট্যশাস্ত্র' নাট্যকলার প্রাচীনতম গ্রন্থ। নাট্যশাস্ত্রের উল্লিখিত নাট্যোৎপত্তি বিষয়ক মতবাদই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মতবাদ। ভরতমুনির মতে ভগবান ব্রহ্মা ললিতকলা রূপে নাট্য সৃষ্টি করেছেন—'এবং ভগবতা সৃষ্টে ব্রহ্মণা ললিতাত্মকম্।' দেবতা ও মহান ঋষিদের অনুরোধে এবং লোকপিতামহ ব্রহ্মা নিজস্ব উপলব্ধিতে ত্রেতাযুগে সর্বসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য সার্ববর্ণিক পঞ্চম বেদরূপে নাট্যবেদ সৃষ্টি করেন। নাট্যশাস্ত্রের বিবরণ অনুসারে ব্রহ্মা ঋগ্বেদ থেকে পাঠ্যাংশ, সামবেদ থেকে সংগীত, যজুর্বেদ থেকে অভিনয় এবং অথর্ববেদ থেকে রস আহরণ করে নাট্য রচনা করেন। নাট্যশাস্ত্রে আরও বলা হয়েছে যে, নাট্যবেদকে আরও হৃদয়গ্রাহী করার জন্য শিব কর্তৃক তাণ্ডব নৃত্য এবং পার্বতী কর্তৃক লাস্যনৃত্য সংযুক্ত হয়েছে। ভরতমুনির নির্দেশে স্বর্গালোকে 'অমৃতমন্থন' এবং 'ত্রিপুরদাহ' নামক ব্রহ্মা রচিত দুটি নাটক অভিনীত হয়। কালক্রমে স্বর্গের অভিনয় প্রচারিত হয় মর্ত্যলোকে।

১৯০৯ থেকে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় টি. গণপতি শাস্ত্রী কেরলের অন্তর্গত মন্‌লিক্‌করনাথম্ নামক স্থানে তেরটি নাটকের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সেই নাটকগুলিকে চারশ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা---(১) রামায়ণ মূলক নাটক---প্রতিমা ও অভিষেক নাটক। (২) মহাভারতমূলক নাটক---দূতবাক্য, কর্ণভার, দূতঘটোৎকচ, মধ্যমব্যায়োগ, পঞ্চরাত্র, উরুভঙ্গ, বালচরিত। (৩) বৃহৎকথামূলক নাটক--- স্বপ্নবাসবদত্তা, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ। (৪) কথামূলক নাটক— অবিমারক, চারুদত্ত। প্রত্যেক নাটকেই ভরতবাক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাক্‌বৈদিক ও বৈদিক কর্মকাণ্ড থেকে ভারতের অনুকূল পরিবেশে ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের যে বীজ উপ্ত হয়েছিল, প্রাচীনতম প্রামাণ্য নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা মহামুনি ভরত বিশ্বে তার চিরস্থায়িত্ব দান করে গেছেন। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

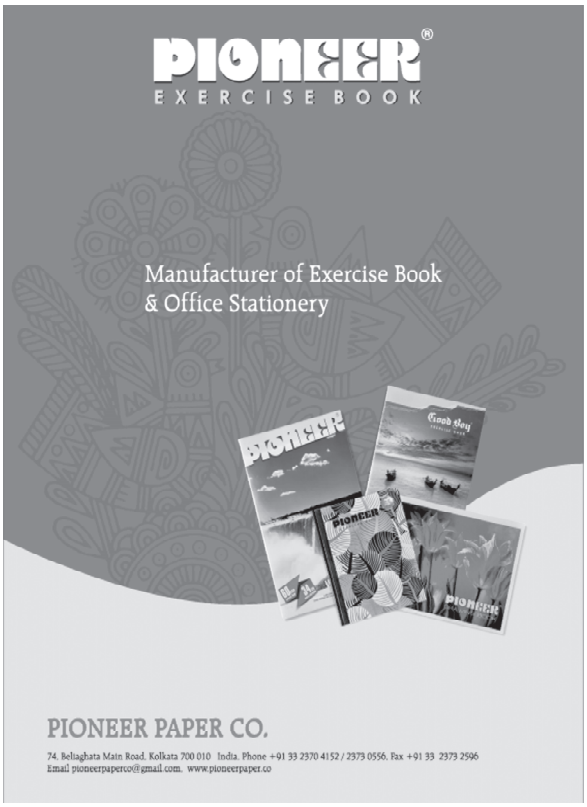

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

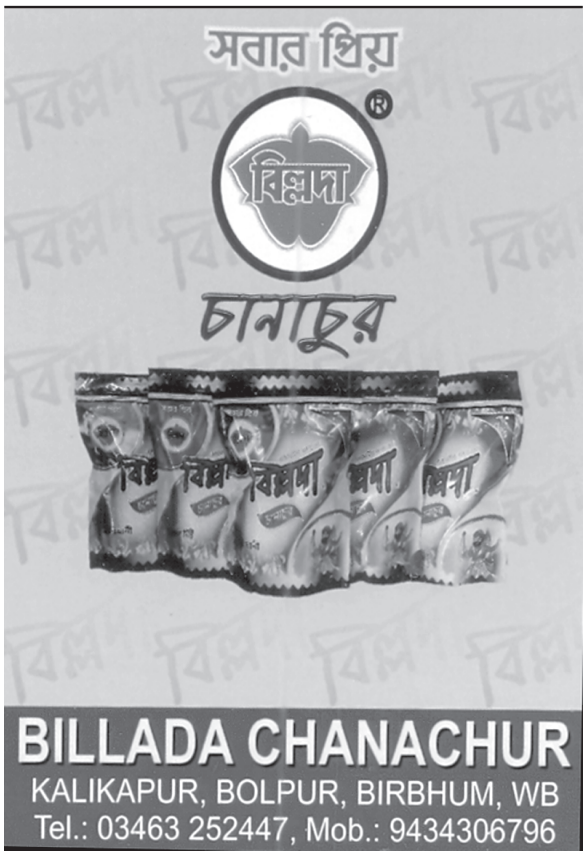

বাঙ্গলার ব্রত ও গৃহিণী নির্মাণ

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

সুবচনী ব্রত :

'আমার মার বাপের বাড়ি' গ্রন্থে রাণী চন্দ্র লিখেছেন নানান লোকায়ত ব্রত বিষয়ে। বিস্তারিত আলোচনায় সমকালীন গ্রামীণ পরিবেশ, পারিবারিক সম্পর্ক এক লহমায় উঠে আসে। গ্রামের উন্মুক্ত বিলের ঘাটলার উপর পৈঠাতে রয়েছে লালরঙের পুতুলের মতো শোয়ানো তেল-সিঁদুরে পুরু হয়ে ওঠা 'সুবচনী'র ত্রয়ী মূর্তি— আকলি, সুমতি, ভগবতী— এই তিন বোন, একত্রে সুবচনী। ছোটো ছেলের মানুষ আঁকার মতো সে পুতুল। একটা গোলাকার মাথা, দুপাশে ঊর্ধ্ব বাহুর মতো দুই হাত, হাঁটু ভেঙে দাঁড়ানোর ভঙ্গি। লোকবিশ্বাস, এরা গৃহস্থকে সুখবর এনে দেন— সংসারের স্বামী, সন্তানেরা বিদেশ- বিভুঁইয়ে থাকে। সংসারে অসুখবিসুখের জ্বালাযন্ত্রণা, প্রতিনিয়ত অঘটন-দুর্ঘটন, আর তখনই কাছের জনের সংবাদ না পেলে মা-মাসির বুক কেঁপে ওঠে। কুশল খবর এনে দেবার জন্য মায়েরা তাই সুবচনীকে ডাকেন। কুশল সংবাদ পেলে সবচাইতে আগে স্মরণ করেন তাঁকেই। ব্রতের উপাদান খুবই সামান্য— পিতলের রেকাবিতে পান-সুপারি সিঁদুর, ছোটো বাটিতে সামান্য তেল সাজিয়ে গৃহকর্ত্রী আসেন ঘাটলায়; দেওয়া হয় উলুধ্বনি। সুসংবাদের বার্তা পেয়ে গ্রামবাসী ছুটে আসেন, যোগ দেন সুবচনীর ব্রতকথায়। মানতকারিণী সুবচনীকে তেল-সিঁদুর মাখিয়ে, তিন বোনকে তিনটি গোটা সুপারি, বাতাসা দিয়ে, ফুল-দূর্বা হাতে নিয়ে ঘিরে বসেন। ব্রতকথা চলতে থাকে— এক জন্মদুঃখী অনাথ ছেলে 'দুইখ্যা'র অতীব দুঃখে দিন কাটার কথা। সে বনেবাদাড়ে ঘোরে, কচুঘেঁচু খায়। এদিকে সুবচনীরা তিন বোন হিজলতলায় দাবা পাশা খেলেন। একদিন তিন বোনের দেখা পায় দুইখ্যা, আর পায় তাদের দয়া। সেই দয়ার সংবাদ জগতে ছড়িয়ে দিতে সুবচনীর ব্রত চালু হয়। এ ভাবেই যেন অকূলপাথারে পড়লে পাড়ে তোলেন সুবচনী। বর দেন। বাঙ্গলার নারীর এক মনস্তাত্ত্বিক অবলম্বন। ব্রত শেষ হলে পুনরায় উলুধ্বনি পড়ে। ব্রতকারিণী সকল নারীর মাথায় আশীর্বাদী তেল ছোঁয়ান, হাতে দেন পান সুপারি। সধবাদের কপালে সিঁদুর পরানো হয়। ছোটোরা ব্রতকথা শুনে দুটো বাতাস পায়। সকলে মঙ্গলানন্দে গৃহে ফেরেন। গাঁয়ের পরিবেশে একজনের সুখবরে পাঁচজন আনন্দিত হন, এ এক অন্তরঙ্গ গ্রামীণ সম্পর্ক। বিবাহের অনুষ্ঠান, গাঁয়ের মেয়ে শ্বশুর বাড়ি যাবে, সবই জানানো হয় সুবচনীকে। সঙ্গে উলুধ্বনির শুভ-সংকেত।

লালুব্রত :

রাণী চন্দ্র উল্লেখ করেছেন 'লালুব্রত'র কথাও, এরই নাম 'লাউল্যার বর্ত'। এই ব্রতের উৎসাহী ও পৃষ্ঠপোষক তাঁর দিদিমা। ব্রতের জন্য ছোটো ছোটো দুটি কাঠের পিঁড়ি গড়িয়ে দেন দুই বোনকে। পিঁড়ির উপর শীতের বিকেলে পুকুরপাড়ের নরম মাটি দিয়ে স্তূপ গড়া হয়, সেটাই লালু— না শিব না মন্দির। দুই বোনে বিকেলে রং-বেরঙের ফুল তোলে, যা সারারাত তাজা থাকবে, ভোরেও সতেজ দেখাবে। প্রদীপের আলোয় বসে সন্ধ্যায় দুই বোন সেই ফুল দিয়ে লালু সাজায়, ফুলে ফুলে লালুর সর্বাঙ্গ ঢেকে যায়, একটুও গা দেখানোর জো নেই। হলুদ অতসীর বোঁটা লালুর গায়ে গাঁথা হয়, গাঁদা-টগর-কলকে ফুলে সজ্জিত হয় লালুর দেহ ও পিঁড়ি। সাজানো হয়ে গেলে খাটের নীচে ঠেলে দুই বোন ঘুমাতে যায়। পরদিন ভোরবেলা দিদিমা ডেকে তোলেন তাদের, গায়ে গিঁট দিয়ে শীতের কাঁথা বেঁধে দেন, ঘুম-ভরা চোখ নিয়ে লালুর পিঁড়ি সঙ্গে করে কুয়াশা ঠেলে দুই বোন গাঁয়ের পথ চলে, দিদিমার হাতে ফুলের সাজি— শিশিরে ভেজা মাটিতে সকলের পা ভিজে যায়; ভোরের শুকতারা তখন জ্বলজ্বল করছে। পুকুরের ঘাটলায় জলের ধারে সিঁড়িতে লালু বসানো হয়; তখন জলের উপর ঘন কুয়াশার পরত। এই কুয়াশাই ব্রতচারিণী ভাঙবে, তবেই সূর্যদেব ঝিকিমিকি দিয়ে পুবের আকাশে উঠবেন— এটাই হলো লালুব্রত। অন্য বাড়ির বালিকারাও একে একে আসে। এক একটি ছড়া সুর করে কেটে ফুল নিয়ে জলে ফেলা হয়— "উঠো উঠো সূর্যিঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া,/ না উঠিতে পারি মোরা শিশিরের লেইগা।" নীচে থেকে ধীরে ধীরে উঁচু গাছে কুয়া উঠে যায়, ভোর ছেড়ে সকাল হয় বিশ্ব।

এই যে কনকনে শীতের জড়িমা ছেড়ে

সূর্য ব্রত

লক্ষ্মী ব্রত

উঠার প্রশিক্ষণ, এই যে সাজানোর নান্দনিকতা বাঙ্গলার মেয়েদের দেওয়া শুরু হতো সেই অল্প বয়সে তা যেন প্রকৃতির সঙ্গে খাপখাওয়ানোর এক ট্রেনিং, নন্দনতত্ত্বের শিক্ষা— যার নেতৃত্বে থাকতেন দিদিমা-ঠাকুমারা, ছাত্রী তৃতীয় প্রজন্ম। এমন করেই শীতের একমাস ধরে রোজ রোজ লালু গড়া হয়, ফুল তোলা হয়, লালু সাজানোর পালা চলে আর ভোরের আলো-আঁধারিতে ঘাটলার ধারে নিত্য আচার-আচরণ। কার লালু কত সুন্দর, কত কেরামতির— সেও এক প্রতিযোগিতা— সুনিপুণ গৃহিণী হয়ে উঠার শিক্ষা! বাঙ্গলার নারী এভাবেই গড়ে উঠেছে বাল্যকাল থেকে।

ব্রত কাকে বলে?

কোনো কিছু কামনা ও চেষ্টা করে, আশাআকাঙ্ক্ষা করে প্রকৃতিকে অনুকরণের মাধ্যমে যে লৌকিক-সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন, তাকেই বলে ব্রত। এই কামনার প্রতিচ্ছবিতে আলপনা মূর্ত হয়ে ধরা দেয়, প্রকাশ পায় লোকায়ত পরব। এ পূজারি-তন্ত্রমন্ত্র বর্জিত লোকায়ত অনুষ্ঠান, যার সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে পূজানুষ্ঠানের। পূজা সুনির্দিষ্ট সময়ে হয়, সকলের জন্যই তার অনুষ্ঠান; ব্রতটি অনুষ্ঠিত হয় কোনো কিছু কামনা করে, ব্রতিনীর জন্যই এই অনুষ্ঠান। যতক্ষণ না কামনার পরিসমাপ্তি হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্রত চলতে থাকে। কামনার শেষ ব্রতের উদ্‌যাপন হয়।

ব্রতের প্রকারভেদ :

অবনীন্দ্রনাথ উল্লেখ করছেন ব্রত দুই প্রকার : (১) শাস্ত্রীয় বা পৌরাণিক ব্রত এবং (২) মেয়েলি ব্রত। মেয়েলি ব্রত দ্বিবিধ— কুমারী ব্রত এবং নারী ব্রত (বিয়ের পর যা পালিত হয়)। পৌরাণিক ব্রতগুলি হিন্দুধর্মের সঙ্গে ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়েছে। মেয়েলি ব্রতগুলি পুরাণের পূর্বেকার বলে উল্লেখ করেছেন অবনীন্দ্রনাথ, যার মধ্যে প্রাক-হিন্দু ও হিন্দু ধর্মের একটা আদান-প্রদান চলেছিল বলে তিনি বিশ্বাস করেছেন।

শাস্ত্রীয় ব্রতে সামান্য কাণ্ড। ভুজ্যি-উৎসর্গ এবং ব্রাহ্মণ-দক্ষিণার পর ব্রতকথা শ্রবণের আয়োজন করা হয়। ব্রত কেন পালন করা হবে, কীভাবে ব্রত পালনে রুচি আসেব— সে কারণেই ব্রতকথা শোনার আয়োজন।

নারীব্রত হলো শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয়— এই দুই অনুষ্ঠানের সমন্বয় বা যুগলমূর্তি। এতে যেমন বৈদিক অনুষ্ঠানের গভীরতা বিলুপ্ত হয়েছে, পাশাপাশি লৌকিক সরলতা হারিয়ে উদয় হয়েছে পূজারি ব্রাহ্মণের অংশগ্রহণ; তাই ন্যাস-মুদ্রা-তন্ত্র-মন্ত্রের প্রাধান্য ঘটেছে। বরং লৌকিক সরলতার খাঁটিভাব পরিলক্ষিত হয় কুমারী ব্রতের মধ্যে। এ যেন হিন্দুধর্মের সুলভ সংস্করণ, কুমারীর মনোজগতে প্রতিষ্ঠার এক প্রচেষ্টা। খাঁটি মেয়েলি ব্রতের ছড়ায় আর আলপনায় একটি জাতির মন, চিন্তা ও চেষ্টার ছাপ রয়ে যায়।

শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় ব্রতের ফারাক কতটা তা বুঝতে সূর্য উপাসনা মূলক ব্রতের সূর্য-আহ্বানকে বিশ্লেষণ করা যাক। বৈদিক সূর্যস্তব এই রকম : ঊষাদেবতা। অঙ্গিরাপুত্র কুৎস ঋষি। সূর্যদেবতা। কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি।

মেয়েলি ব্রতের সূর্যস্তব এইরকম : ''নমঃ নমঃ দিবাকর ভক্তির কারণ, / ভক্তিরূপ নাও প্রভু জগৎ-কারণ।/ভক্তিরূপে প্রণাম করিলে তুয়া পায়, / মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি করেন প্রভু দেবরায়।।''

আবার খাঁটি মেয়েলি ব্রতের মন্ত্র এমন : ''উরু উরু দেখা যায় বড়ো বড়ো বাড়ি,/ওই যে দেখা যায় সূর্যের মা'র বাড়ি।/ সূর্যের মা লো! কী কর দুয়ারে বসিয়া!/তোমার সূর্য আসতেছেন ষোড় ঘোড়ায় চাপিয়া।''

স্বামী নির্মলানন্দ ব্রতগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন—

১. কিছু ব্রত নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও চরিত্র গঠনের সহায়ক; যেমন কুমারী ও সধবা ব্রতের অনুষ্ঠান।

২. কিছু ব্রত শান্তিময় পারিবারিক জীবন গঠনের সহায়ক।

৩. কিছু ব্রত সামাজিক ও জাতীয় কল্যাণ সাধরনের অভীপ্সাকে বাস্তবায়ন করার প্রেরণাদায়ক।

৪. কিছু ব্রত উদ্‌যাপন গভীর আশ্বাস ও অভয়ের সহায়ক।

৫. কিছু ব্রত প্রবৃত্তির উদ্দাম প্রবাহ থেকে প্রত্যাবৃত্তের এবং নিবৃত্তির সহায়ক।

নানান মাসের ব্রতানুষ্ঠান :

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে পালিত হয় বসুধারা ব্রত। উদ্দেশ্য বসুধা বা পৃথিবীকে উর্বরা এবং শস্য-সবুজ করে তোলা। ফসলের জন্য জল লাগে, জলের জন্য বৃষ্টি, বৃষ্টি, কামনায় এই ব্রত। বৈশাখ মাসের আর একটি ব্রত হলো দধিসংক্রান্তি। এটি সৌরজগৎ বিষয়ক একটি ব্রত। এছাড়া কলাছড়া ব্রত, ঘৃত সংক্রান্তি ব্রত, আদর সিংহাসন ব্রতও বৈশাখ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। অরণ্যষষ্ঠী/জামাইষষ্ঠী/বাঁটাষষ্ঠী ব্রত উৎযাপিত হয় জ্যৈষ্ঠমাসে। সুসন্তান কামনার এই ব্রত। আষাঢ়মাসে নাগপঞ্চমী ব্রত অনুষ্ঠিত হয়; তাতে পূজিতা হন দেবী মনসা। সর্পপূজা এই ব্রতের অঙ্গ। ব্রত উদ্‌যাপন করলে সর্পভয় নিবারিত হয়। ভাদ্র মাসের একটি ব্রত হলো ভাদুলি। বিদেশ-বিভূঁয়ে পরিবারের বাবা-দাদা-ভাইয়েরা নিরাপদে থাকুক, ফিরে আসুক সুস্থ শরীরে, সেজন্যই এই ব্রতের উদ্‌যাপিত হয় রা'লদুর্গা ব্রত (সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য ও মনস্কামনা পূরণের ব্রত)। মাঘ মাসে কালুই ব্রত (বাঘের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য), শীতলা ব্রত (বসন্ত রোগ নিবারণের জন্য ব্রত)। চৈত্র মাসের ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে মহাবিষুব সংক্রান্তি ব্রত, ঘেঁটু ব্রত (চর্মরোগ নিবারণের জন্য ব্রত) উল্লেখযোগ্য।

বসুধারা ব্রত :

ভারতের নারীরা পারিবারিক মঙ্গলের জন্য চৈত্র সংক্রান্তি থেকে টানা একমাস তুলসীমঞ্চতে তুলসীধারার ব্যবস্থা করেন। একটি মাটির হাঁড়িতে তলায় ছোটো একটি ফুটো করে, তাতে পলতের কাপড় বা কুশ প্রবেশ করিয়ে অতি ধীর ধারায় সেচের বন্দোবস্ত করেন তারা, একে বিন্দুপাতি সেচ বলা যেতে পারে, ইংরেজিতে Drip Irrigation। ভারতীয় নারী যে বসুধারা ব্রত পালনের অঙ্গ হিসেবে স্নান সেরে সেই

ইতু পুজো

টুসু পুজো

ঝারায় জল ঢালেন এবং তুলসী পূজা করেন তাও তুলসী নামক এক পবিত্র ও ভেষজ উদ্ভিদের প্রতি ধন্যবাদাত্মক চিন্তন। বাঙ্গলার নারী আবৃত্তি করে, ''তুলসী তুলসী নারায়ণ/ তুমি তুলসী বৃন্দাবন/ তোমার শিরে ঢালি জল/অন্তকালে দিও স্থল।'' যেন জীবনকালে এ এক মহার্ঘ ভেষজ আর অন্তিমকালেও জীবনের মায়াজাল থেকে মুক্তির মহৌষধি; বাঙ্গলার ব্রতেও তারই পুণ্য-পূজন। কবি অক্ষয় কুমার বড়াল 'এষা' কাব্যগ্রন্থে লিখছেন, ''তোমার নিঃশ্বাসে/সর্বরোগ নাশে/যায় দুঃখ পলাইয়া।'' নানান ব্যাধিতে বনবাসী কৌম সমাজ তুলসীর ব্যবহার করে থাকে; কখনো এর ব্যবহার সর্দি-কাশিতে, কখনো লিউকোডারমার চিকিৎসায়, কখনো দাঁদের ক্ষত দূর করার জন্য কখনো বা ম্যালেরিয়া ঘটিত জ্বরনাশক রূপে।

প্রস্তুত প্রবন্ধে একটি ব্রতের বিস্তারিত আলোচনা করে ব্রতের উদ্দেশ্য, তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা যাক।

মাঘমণ্ডলের ব্রত :

সাবেক পূর্ববঙ্গে প্রচলিত এবং প্রতি মাঘ মাসে পালিত পাঁচ বছর ব্যাপী সূর্যোপাসনা মূলক একটি কুমারীব্রত হলো মাঘমণ্ডল। এই ব্রতের দুটি মূল কৃত্য হলো পঞ্চগুঁড়ির রঙিন আলপনা অঙ্কন এবং 'বারৈল' বা 'লাউল' নামক মৃত্তিকা-প্রতীক নির্মাণ, ফুল-দূর্বা দিয়ে তার সাজসজ্জা ও পূজা। মাঘমণ্ডল ব্রতে আঙ্গিনায় অঙ্কিত হয় ব্রতমণ্ডল; তার উপরে গোলাকার সূর্য আর নীচে অর্ধচন্দ্র বা চন্দ্রকলা; মাঝে অয়ন মণ্ডল। অয়ন-চিহ্নের সংখ্যা দ্বারা উপলব্ধ হয় ব্রতের পূর্ণতার বছর। আমার মা'র বাপের বাড়ি গ্রন্থে রাণী চন্দ লিখছেন, ''এক বছরে এক গোলের আলপনা, দু' বছরে দু গোলের। এক গোলের গায়ে আর একটি বৃত্ত দাগা...তিন বছরে তিনটি বৃত্ত, চার বছরে চারটি— আর পাঁচ বছরে পরপর রেখা টানা পাঁচটি বৃত্তের প্রকাণ্ড একটা আলপনা''। মাঘ মণ্ডলের ব্রতে পিটুলি গোলার আলপনা দেওয়া হয় না, দিতে হয় চালের গুঁড়ির সঙ্গে হলুদ, সিঁদুর, ধানের পোড়ানো তুষ, শুকনো বেলপাতার গুঁড়ো মিশিয়ে নানা বর্ণে রঞ্জিত করে রঙিন আলপনা। রোজই দেওয়া হয় এই আলপনা, দু' আঙুলের টিপে গুঁড়ি নিয়ে আঙুল সামান্য নাড়িয়ে ঝুরঝুর করে ফেলে আঁকা হয় লতাপথ। পৌষের সংক্রান্তি থেকে মাঘের সংক্রান্তি পর্যন্ত চলে এই ব্রত।

'হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান' গ্রন্থে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী লিখছেন, ''প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া ব্রতিনীকে দূর্বাগুচ্ছের সাহায্যে চোখে ও মুখে জল ছিটাইতে হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম 'চউখে মুখে পানি দেওয়া'। সূর্য উঠলে পাঁচালি গান করিয়া 'বারৈল' ভাসান হয়।... বারৈল দুইটিকে ফুল দূর্বা দিয়া সাজাইয়া একখানি ছোটো তক্তার উপর বসাইয়া পুষ্করিণীর জলে ভাসাইতে হয়। ইহার পর মণ্ডলের উপর ফুল দিতে হয়। পাঁচালিতে সূর্যের পূর্বরাগ ও বিবাহের কাহিনি বর্ণিত হইয়াছে।''

গ্রামের কিশোরীরা কাকভোরে মাথা-ঘাড়ে কাঁথা জড়িয়ে ঘন কুয়াশা ঠেলে তাদের মা কিংবা দিদা-ঠাকুমার সঙ্গে দু'পাশের ঝোপ ছাড়িয়ে, শিশিরে ভেজা ঘাস মাড়িয়ে চলে ঘাটলায়। কে আগে ঘাটে যাবে যেন তার প্রতিযোগিতা চলে। জলের কাছে ঘাটে রাখা হয় বারৈল বা লাউল। তার সর্বাঙ্গ অতসী, টগর, কলকে, গাঁদা অথবা নানান বুনো ফুলে ঢাকা, কারণ তার গা দেখা গেলেই দোষ। আগের রাতে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল এই বারৈল।

''সূর্য উঠবেন, তাই তার পথ প্রশস্ত করতে কিশোরীরা সাজির ফুল জলে ছুঁড়ে সুর করে গায়, ''খুয়া ভাঙি খুয়া ভাঙি অ্যাচলার আগে,/ সকল খুয়া গেল বড়োই গাছটির আগে।'' ধীরে ধীরে বড়োই বা কুল গাছের মাথা পরিষ্কৃত হয়ে কুয়াশা দূরীভূত হয়, সূর্য ওঠে, তার আলোকিত করুণার পৃথিবী সচল হয়। 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' গ্রন্থে স্বামী নির্মলানন্দ লিখেছেন, ''তিনি উদিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ধোপা, নাপিত, কামার, কুমোর, তাঁতি, সুরি, তিলি, মালী সকলকে জাগিয়ে তোলেন, সকলের গৃহই তিনি আলোকিত করেন, তখন প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্তব্যে ব্রতী হয়— সমগ্র জগৎ কর্মচঞ্চল হয়ে উঠে। ব্রাহ্মণ বধূ উপবীত, তন্তুবায় বধূ বস্ত্র, কর্মকার বধূ মাল্যাদি সরবরাহে ব্যস্ত হয়। ব্রতের ছড়ার ভিতরে এ দৃশ্যের এক চমৎকার বর্ণনা পরিস্ফুট। সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্ববোধের একটা পরিষ্কার ছবি কুমারীদের অন্তরে স্বতঃ জাগ্রত হয়। ব্রতের ছড়ার মধ্যে এ রকম অনেক শিক্ষাই আছে।''

এই ব্রতের সবচাইতে আকর্ষণীয় বিষয়টি দেখানো হয়েছে চন্দ্রকলার

সঙ্গে সূর্যের বিবাহানুষ্ঠানের প্রসঙ্গে। মাধবের কন্যা অপরূপ লাবণ্যবতী তন্বী-বালা চন্দ্রকলা। তাকে দেখে, তার রূপে সূর্য পাগল হয়ে বিয়ে করতে চান। ছড়ায় দেখতে পাই—

''চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেলিয়া ছিলেন কেশ।
তারে দেইখ্যা সূর্য ঠাকুর ফিরেন নানা দেশ।।
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেলিয়া দিচ্ছে শাড়ি।
তারে দেইখ্যা সূর্য ঠাকুর ফিরেন বাড়ি বাড়ি।।
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা গোল খাড়ুয়া পায়।
তারে দেইখ্যা সূর্য ঠাকুর বিয়া করতে চায়।।''

সূর্যের মতো এক পাত্র পেলে মাধবের আপত্তি থাকার কথা নয়, তাই সুসম্পন্ন হয়ে গেল তাদের শুভবিবাহ। সূর্য পেলেন অজস্র দান সামগ্রী। কী নেই তাতে; আর হবেই বা না কেন? মাধব যে লক্ষ্মীপতি! অতএব বিয়ের পর চন্দ্রকলা চললেন পতিগৃহে; আর এখানেই দেখানো হয়েছে বিচ্ছেদ আর মিলনের বেদনা-সুখের আনন্দঘন মূহূর্ত, পল্লী বাঙ্গলার চিরায়ত আবেগসঞ্চার। ব্রতিনীদের জীবনেও আসবে এই দিন; মা-বাবা-ভাই-বোন, প্রিয়জন, ক্রীড়াসহচরীদের ছেড়ে যেতে হবে স্বামীগৃহে। আবার মিলনসুখ অপেক্ষা করছে সেখানে, মিলনানন্দের আবেগ, লোকলাজ— সব মিলিয়ে এ এক দুঃখ-সুখের যুগলবন্দি!

মাঘমণ্ডল ব্রতের অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিন-অঙ্কে বিভক্ত ব্রতের ছড়ার অসাধারণ বিবরণ দিয়েছেন তিনি। 'বাঙ্গলার ব্রত' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, ''এই মাঘমণ্ডল ব্রতের প্রথম অংশে দেখা যাচ্ছে যে সূর্য যা, তাঁকে সেই রূপেই মানুষে দেখছে এবং বিশ্বাস করছে যে, জলের ছিটায় কুয়াসা ভেঙে দিলে সূর্য উদয়ের সাহায্য করা হবে। এখানে কামনা হলো সূর্যের অভ্যুদয়। ক্রিয়াটিও হলো কুয়াশা ভেঙে দেওয়া ও সূর্যকে আহ্বান। দ্বিতীয় অংশে চন্দ্রকলাকে দীর্ঘকেশ গোল-খাড়ুয়া-পায়ে একটি মেয়ে এবং সূর্যকে রাজা বর এবং সেই সঙ্গে সূর্যের মা ও চন্দ্রকলার বাপ কল্পনা করে মানুষের নিজের মনের মধ্যে শ্বশুরবাড়ির যে-সব ছবি আছে, সূর্যের রূপকের ছলে সেইগুলোকে মূর্তি দিয়ে দেখেছে। তৃতীয় অংশে সূর্য-পুত্র বা রায়ের পুত্র রাউল বা লাউল, এক-কথায় বসন্তদেব; টোপরের আকারে এঁর একটি মূর্তি মানুষে গড়েছে এবং সেটিকে ফুলে সাজিয়ে মাটির পুতুল হালামালার সঙ্গে বিয়ের খেলা খেলেছে। এখানে কল্পনার রাজ্য থেকে একেবারে বাস্তবের রাজ্যে বসন্তকে টেনে এনে, মাটির সঙ্গে এবং ঘরের নিত্যকাজের এবং খুঁটিনাটির মধ্যে ধরে রাখা হলো''।

লাউল বা লালুর বিয়ে করতে যাবার ছড়াটি খুব মনোরম।

''জলের মধ্যে ছিপছিপানি কিসের বাদ্য বাজে,
চান্দের বেট লাউল্যা আজ বিয়া করতে সাজে।
সাজোরে সাজোরে লাউল্যা সোনার নূপুর দিয়া,
ঘরে আছে সুন্দরী কন্যা তুইল্যা দিমু বিয়া।''

লাউল বউ নিয়ে আসে; বিয়ের ভোজে সূর্য গামছা মাথায় দিয়ে অন্দরমহলে তদারকি করছেন। 'ঝিকুটি' খেলতে গিয়ে পাওয়া গিয়েছে কিছু টাকা, তা দিয়ে লাউলের বউকে শাঁখা কিনে দেওয়া গেল। রইল কিছু, তা দিয়ে ব্রতিনীর মায়ের শাখাও হলো, সব কুমারীরা নিজের মাকে শাঁখা পড়ান— ''লাউল্যার বউরে শাঁখা দিয়া বেশি হইল টাকা/ সেই টাকা দিয়া দিলাম মায়েরে শাঁখা।''

মাটির সঙ্গে সূর্যের ছেলে বসন্তদেব বা লাউলের বিয়ে আর মিলনের পালাও শেষ। ঋতুরাজ পৃথিবীকে ফুলে-ফলে ভরিয়ে বিদায় নিচ্ছেন। তাকে যেতেই হবে, একলাই, আবার শীতের মধ্যে বসন্ত হয়ে ফিরবেন, এখন বিদায়। কিন্তু মেয়েরা বৃথাই তাকে ধরে রাখার চেষ্টা করে— ''কৈ যাওরে লাউল গামছা মুড়ি দিয়া?

তোমার ঘরে ছেইলা হইছে বাজনা জানও গিয়া।

ধোপা জানাও গিয়া, নাপিত জানাও গিয়া, পুরুইত জানাও গিয়া।'' লাউলের ছেলের নাম রাখার অনুষ্ঠান— ''লাউলের ঘরে ছেইলা হইছে কী কী নাম-থুমু?/ আম দিয়া হাতে রাম নাম থুমু।/ বরই দিয়া হাতে বলাই নাম থুমু।/ কমলা দিয়া কমল নাম থুমু।/ জল দিয়া জয় নাম থুমু।/ রাজার বেটা রাজার ছেইলা রাজা নাম থুমু।''

কিন্তু লাউলকে যেতেই হবে। মধুমাস শেষ, বৈশাখের মেঘ দেখা দিল, মেঘ গর্জন করে উঠলো, ঝড় বইলো, উৎসবের সাজ-সরঞ্জাম লণ্ডভণ্ড করে ভেঙে পড়ল ফুলে-ভরা জইতের ডাল। ঋতুরাজকে বিদায় দিতেই হলো— ''আজ যাও লাউল,/কাল আইসো।/নিত্য নিত্য দেখা দিও।/বছর বছর দেখা দিও।''

অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে দেখা যায় মৎস্যজীবী মালো মেয়েরা নিষ্ঠা ভরে মাঘমণ্ডলের ব্রত করছে। মাঘমাসের প্রতিদিন সকালে কুমারী মেয়েরা স্নান করে ভাঁটফুল আর দূর্বাদলে বাঁধা ঝুটার জলে সিঁড়ি পুজো করে উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র আওড়ায়। বিবাহের কামনাতেই এই ব্রত। ব্রতের শেষদিন তৈরি হয় রঙিন কাগজের চৌয়ারি, সেই চৌয়ারি মাথায় করে ভাসানো হয় তিতাসের জলে। অক্ষত চৌয়ারির দখল নিতে কিশোরেরা হুল্লোড় করে ওঠে। উঠোন জোড়া আলপনার মাঝে কিশোরী ছাতা মেলে বসে, তার মা ছাতার উপর ছড়িয়ে দেয় খই-নাড়ু, আর তা কাড়াকাড়ি করে খায় কিশোরেরা।

তথ্যসূত্র :

১. স্বামী নির্মলানন্দ (১৪১০ ষষ্ঠ সংস্করণ) বারো মাসে তেরো পার্বণ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ।

২. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাঙ্গলার ব্রত, ভূমিকা ও টীকা দিব্যজ্যোতি মজুমদার (২০১৪ প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ) গাঙচিল, কলকাতা।

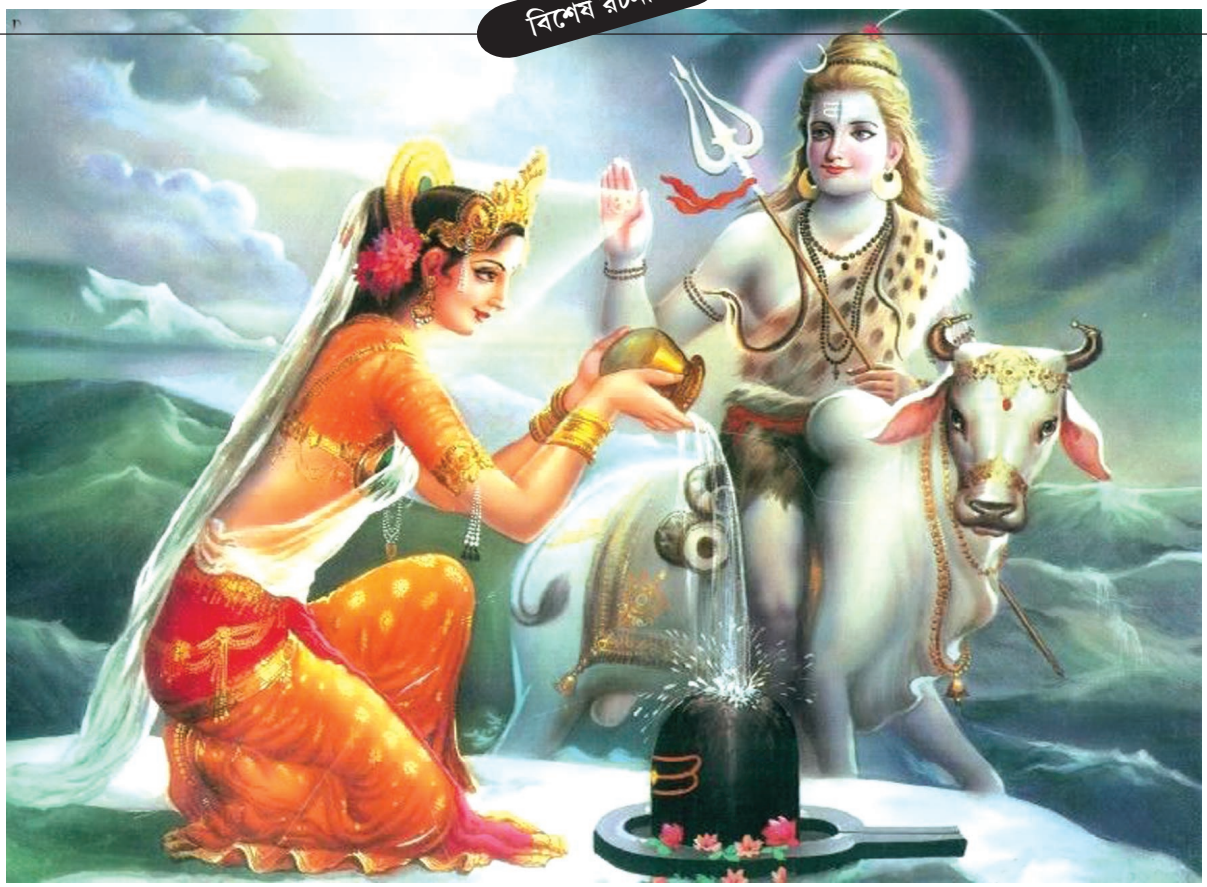

শিবপূজার অর্থ

পূর্বা সেনগুপ্ত

শিব-চতুর্দশীর দিন শিবপূজা মেয়েদের অবশ্যপালনীয় একটি ব্রত। লোকাচার অনুযায়ী এই দিন শিবারাধনায় কুমারী কন্যার শিবতুল্য বরলাভ হয়। যদিও গাঁজা সেবনকারী, শ্মশানচারী শিবের অনুরূপ একটি পাত্র স্বামী রূপে মোটেই জনপ্রিয় হবেন না, তবুও সঠিক কী কারণে যে সংসার-উদাসী শিব কুমারী কন্যার স্বামীলাভের উপায় রূপে বা আদর্শরূপে গণ্য হলেন তা বলা কঠিন। হয়তো বা তিনি সতীর শোকে উন্মত্ত হয়েছিলেন এবং তিনি দক্ষকন্যা সতী ভিন্ন অন্য নারীতে অনুরক্ত হবেন না বলেই মহাযোগ সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন— এই পত্নীপ্রেমই আদর্শ স্বামী হওয়ার প্রধান কারণ হয়েছে। তাঁর এই পত্নী নিষ্ঠাই তাঁকে মহিলামহলে জনপ্রিয় করে তুলেছে।

আজও মা-ঠাকুমার দল বড়ো আহ্লাদে আদরের গৃহকন্যাটিকে আশীর্বাদ করেন, 'শিবের মতো বর হোক একটা!' সীতা-সাবিত্রী যেমন ভারতীয় নারীদের কাছে আইডল ঠিক তেমনিই শিবও স্বামীরূপে আদর্শ হয়ে রয়েছেন বহুকাল। ভোলানাথ যোগী, ত্যাগী, সাংসারিকতায় বিমুখ, দেবকুলের মধ্যে তিনি পৃথক চরিত্র। আবার তিনি দেবকুলকে রক্ষার জন্য বিষপান করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। সকলের জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ শিব ব্যতীত কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

এই কারণেই তিনি দেবাদিদেব। আবার পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে দক্ষকন্যা সতীর প্রতি নিষ্ঠাই হয়েছিল দেবতাদের চিন্তার কারণ। দেবকুলকে উদ্ধারের জন্য এবং তারকাসুরকে বধের নিমিত্ত সতী আবার হিমালয় কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পার্বতী রূপে তিনি শঙ্করগৃহিনী হলেন কিন্তু তার জন্য হিমালয়-কন্যাকে তপস্যা করতে হয়েছিল। তপস্যার সময় তিনি কেবল বৃক্ষের পাতা খেয়ে দিন অতিবাহিত করেন। হয়তো এই কাহিনিই ভারতীয় নারীদের মনে তপস্যার মাধ্যমে স্বামীলাভের ধারণার বীজ বুনেছিল। বিশেষ করে মধ্যযুগে মঙ্গলকার্যের মধ্য দিয়ে শিব-পার্বতীর প্রণয়লীলার উপাখ্যান প্রচারিত হয়েছিল তা আজ ভারতীয় নারীদের মনে শিবরূপ সম্বন্ধে বিশেষ ধারণার সৃষ্টি করেছিল। জনপ্রিয় যাত্রা-কথকতার মাধ্যমে বহুল প্রচারিত কাহিনিগুলি লোককথা ও লোকাচারের সঙ্গে সংস্কৃতির গভীরে প্রবেশ করেছে। শিবই উৎকৃষ্ট স্বামী— এই ধারণাটি সেই সময় থেকেই সৃষ্ট বলে অনুমিত হয়।

এ প্রসঙ্গে বলতেই হয়, শিবপূজা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ভ্রান্ত ধারণা আছে তা বর্তমানে ভেঙে দেওয়া প্রয়োজন। শিবচতুর্দশীর দিন শিবরাত্রি পালিত হয়, এটি হলো একটি দীর্ঘ ও কঠিন ব্রত। শিব কেবল নারীদের নন, পুরুষদেরও আরাধ্য দেবতা, বিশেষ করে সন্ন্যাসীদের দেবতা। তাই ভারতের দশনামী সব সম্প্রদায়ের সাধু এই ব্রত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। শিবপূজা লিঙ্গপূজা নয়, তা মাতৃযোনী ও পিতৃযোনীর একত্র উপাসনা। জীব শিবের কাছে আনত হয় এই কামনায় যে পুনরায় মাতৃযোনী ও পিতৃযোনী অতিক্রম না করতে হয়। অর্থাৎ পুনর্জন্ম যেন না হয়। তাই শিবরাত্রির দিন সকলের প্রার্থনা 'পুনর্জন্ম দুঃখাৎ পরিত্রাহি শম্ভো'— 'হে শিব শম্ভু আমাদের মুক্তি দাও, আর যেন আমাদের জন্মগ্রহণ না করতে হয়।' মেয়েদের স্বামী লাভের থেকে শিবপূজার মূল উদ্দেশ্য এতখানিই পৃথক।

মুক্তপ্রাণ হনুমান

এরা প্রকৃত অর্থেই নিরামিষাশী। গাছের কচিপাতা, ফল অত্যন্ত প্রিয়। গাছের আঠাও খায়। ভারতীয়রা এদের আঘাত করা ভয়ানক অপরাধ বলে মনে করে। ফলের বাগান বা খেতখামারে কিংবা বাড়িঘরে হামলা চালালেও ভয় দেখিয়ে শুধুমাত্র তাড়াবার চেষ্টা করা হয়, এর বেশি কিছু নয়। ভারতবর্ষে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সর্বত্রই এদের দেখা মেলে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় গাছপালা ঢাকা শহরতলী বা শহরাঞ্চলে দেখা মেলে। বিশেষ করে মন্দির বা দেবালয়ের আশেপাশে যেখানে মানুষজন খাবারদাবার দেয়।

আমাদের দেশে আট প্রজাতির হনুমানের দেখা মেলে। পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায় দুই প্রজাতির। এদের মুখের চারপাশে বড়ো বড়ো লোম। চার হাতে-পায়ে ভর দিয়ে দৌড়য়। এক লাফে কুড়ি-পঁচিশ হাত চলে যেতে

এদের বলা হয় সেমনোপিথেকাস এনটেলাস। পুরনো নাম প্রসবিটিস এনটেলাস। ইংরেজি নাম হনুমান লাঙ্গুর। হিন্দিতে বলে হনুমান। এরা সারকোপিথেসিডি প্রজাতির। কলোবিনি উপপ্রজাতির অন্তর্ভুক্ত।

সব হনুমানেরই হাত-পা বেশ লম্বা, সরু। মুখ কালো। শরীর ধুসর বা কালচে-ধূসর বা রুপোলি ধূসর। কখনোও কখনাও হালকা হলুদ ছোঁয়া থাকে। বসে থাকলে দুই থেকে আড়াই ফুট বা তার বেশিও হয়। এরা মূলত জঙ্গলের অধিবাসী হলেও গ্রামে-গঞ্জে, পারে। সাধারণত একটি দলে দশ-বারোটি হনুমান থাকে। কখনোও সত্তর-আশি থেকে একশো হতে পারে।

এরা ভোরবেলা থেকে খাওয়াদাওয়া শুরু করে। ঠিকমতো খাদ্য সংগ্রহ করতে না পারলে খিদের জ্বালায় মানুষের ওপর আক্রমণ করে। লোকালয়ে হানা দেয়। রাতের দিকে কিছু খায় না। অত্যন্ত সমাজবদ্ধ। যেকোনো পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারে। নিজেদের মধ্যে মিলমিশ খুব। বিশেষ করে এদের মাতৃস্নেহ প্রাণ ভরিয়ে দেয়। দিনের শেষে নিজেদের সুখী গৃহকোণে ফিরে আসে। সম্ভবত বাঘ ও চিতার ভয়েই বড়ো বড়ো গাছের উঁচু ডালপালায় আশ্রয় নেয়। অসাধারণ দক্ষতায় বাচ্চাকে কোলে নিয়ে এক গাছ থেকে আর এক গাছে এদের লাফ দিয়ে চলে যাওয়া দেখার মতো। এরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে না। দলে একজন দলপতি থাকে। মা হনুমান সন্তানের প্রতি নিবেদিত প্রাণ। প্রথম ছ'মাস চোখের আড়াল করে না। প্রসবের আগে ধাত্রীর কাজ করে দলের অন্য দশটি মেয়ে হনুমান। প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাকে ধাত্রীমায়েরা মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নেয়। ওরাই যত্ন নেয়, সেবা করে। মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেয় চব্বিশ থেকে বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে। মা তখন বুকের দুধ দেয় বাচ্চাকে। বাচ্চা মায়ের বুক আঁকড়ে ধরে থাকে। এ সময় অন্যরা হুপ্ হুপ্ আওয়াজ করে, নেচে অল্পবিস্তর আনন্দ প্রকাশ করে।

ছোটোবেলায় পর্যাপ্ত হনুমান দেখেছি এই কলকাতা শহরেই। সবচেয়ে বেশি দেখেছি দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটিতে। এখানেই তো এদের প্রথম পাঠ নিয়েছিলাম। তবে আজ বড়ো দুর্দিন। সংখ্যায় ক্রমশ এরা কমে আসছে। শহরে ওদের জন্য মুক্তাঞ্চল কই? খাদ্য সুরক্ষা কই? ভারতীয় বন্যপ্রাণী রক্ষা আইনে সিডিউল টু অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুত্বে এরা সংরক্ষিত। এদের ক্ষতি করা দণ্ডনীয় অপরাধ। ইদানীং পশুক্লেশ নিবারণের জন্য সরকার এদের নিয়ে খেলা দেখানো বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের নাগরিক বা সামাজিক জীবনে একান্ত প্রতিবেশী বা আপনজনের মতো সঙ্গ দিয়েছে, আমাদের সমৃদ্ধ করে চলেছে। বলা ভালো মানবজীবনকে পূর্ণতা দিয়ে চলেছে কাক, চড়াই, কাঠবেড়ালি, বেড়াল, কুকুর, পায়রা, শালিক, বানর, হনুমান প্রভৃতি। এদের সঙ্গেই তো বেড়ে উঠেছি আমরা সংসারে। এ যেন জন্মজন্মান্তরের সখ্য।

—তাপস অধিকারী

ভারতের পথে পথে

মানালি

কুলু থেকে ৪০ কিলামিটার উত্তরে হিমাচলের অন্যতম পর্যটন স্থল মানালি। মনুর আশ্রয়স্থল পুরাকালের মানালসু আজকের মানালি। কুলু ভ্যালির শেষ এই মানালি। পাইন আর দেবদারুর ছায়াঘেরা তুষারধবল পাহাড়ের মাঝে পাহাড়ি শহর মানালি। এখানকার বাড়িঘর পাহাড়ি শৈলীতে নির্মিত। অলংকৃত প্রবেশপথ, কাঠের ব্যালকনি আর ছাদ পাথরের। রয়েছে হিড়িম্বা মন্দির। মহাভারতের ভীমের পত্নী হিড়িম্বা রাক্ষসী হলেও মানালিতে তিনি দেবী। চার ধাপের প্যাগোডাধর্মী ২৭ মিটার উঁচু কাঠের মন্দির। স্থানীয় লোকেরা ঢুংরি মন্দির বলে। মন্দিরে পাষাণবেদিতে ভগবান বিষ্ণুর পায়ের ছাপ রয়েছে। দেবীমূর্তি পেতলের। ধুমধাম সহকারে দশেরা উৎসব হয়। মানালি ক্লাব হাউস, তিব্বতীয় মনাস্ট্রি গধান টেকছোকলিং গুম্ফা, শাক্যমুনি মন্দির, মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, বশিষ্ঠ আশ্রম, লক্ষ্ম ণকুণ্ড, রামমন্দির, ঘটোৎকচ মন্দির, ত্রিলোকনাথ মন্দির, গরম জলের কুণ্ড প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান।

জানো কি?

এককথায় প্রকাশ

- করার ইচ্ছা — চিকীর্ষা। • গমন করার ইচ্ছা--জিগমিষা
- নিন্দা করার ইচ্ছা— জুগুপ্সা। • বেঁচে থাকার ইচ্ছা— জিজীবিষা।
- পাওয়ার ইচ্ছা— ঈপ্সা। • মুক্তি পাবার ইচ্ছা— মুমুক্ষা।
- বিজয় লাভের ইচ্ছা— বিজিগীষা।
- প্রবেশ করার ইচ্ছা— বিবিক্ষা।
- বমন করার ইচ্ছা—বিবমিষা। • ক্ষমা করার ইচ্ছা--- তিক্ষিক্ষা।
- ত্রাণ লাভ করার ইচ্ছা— তিতীর্ষা।

ভালো কথা

দু'টাকার ডাক্তার

বাড়ি সুন্দরবনের চাঁড়ালপানি গ্রামে। অভাবের সংসার। তিনবেলা টিউশানি করে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ থেকে ৭৯ সালে ডাক্তারি পাশ করেন। কলকাতায় থেকে ডাক্তারি শুরু করলেন। কিন্তু মন ভরল না। গ্রামের লোকেদের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদতে থাকে। তাই কলকাতার ডাক্তার ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে ওষুধ চেয়ে নিয়ে গ্রামে গিয়ে গরিব মানুষদের চিকিৎসা শুরু করলেন। ধীরে ধীরে এটা তাঁর নেশায় পরিণত হলো। ১১ কাঠা জমি কিনে স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তুললেন। নাম দিলেন 'সুজন'। ফি মাত্র দু'টাকা। আজও তিনি দু'টাকায় চিকিৎসা করে চলেছেন। গরিব মানুষের কোনো পরীক্ষানিরীক্ষার বা ভালো চিকিৎসার দরকার হলে তিনি নিজেই কলকাতা নিয়ে এসে নিজের খরচেই তা করেন। এলাকায় তিনি গরিবের বন্ধু। এবার সাধারণতন্ত্র দিবসে মোদী সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করে তাঁর এই সেবাকাজের স্বীকৃতি জানিয়েছে। তিনি ডাঃ অরুণোদয় মণ্ডল। তাঁকে আমার প্রাণাম।

তীর্থঙ্কর সরদার, দ্বাদশশ্রেণী, ক্যানিং, দঃ ২৪পরগনা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) য় সা প ড়ি	(১) গ্য হ র যো স্তা স্ত
(২) ও লা য়া রি	(২) বি গ স্ব ন য়ো জ

১০ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) বজ্রকঠিন (২) পাটিগণিত

১০ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) চৈতন্যচরিতামৃত (২)প্রতিহিংসাপরায়ণ

উত্তরদাতার নাম

(১) শ্রেয়সী ঘোষ, অমৃতি, মালদা। (২) শুভ চৌহান, তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, উঃ দিনাজপুর (৩) মৌমিতা দেবনাথ, বিরাটি, কলকাতা-৪৯। (৪) শ্রেয়ান চক্রবর্তী, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ২৪।।

১৯৩৮ সালে হায়দরাবাদে অহিংস সত্যাগ্রহ শুরু হল। ভাইয়াজী দানী তাতে যোগ দিতে যাচ্ছেন। আশীর্বাদ চাইলেন ডাক্তারজীর।

যাও, আমার আশীর্বাদ তো সব সময় আছে।

ডাক্তারজীর শরীর বজ্রের মতো শক্ত ছিল। কিন্তু অবিরাম পরিশ্রমের ফলে বারবার অসুখ হতে লাগল। পিঠে যন্ত্রণা হয়। সর্বদা প্রচণ্ড ঘাম হতো। ফলে দুর্বল হয়ে পড়তেন। এসব সত্ত্বেও সফরসূচির হেরফের হতো না। গ্রাম থেকে গ্রামে, শহর থেকে শহরে যাওয়া, বৈঠক নেওয়া, স্বয়ংসেবক এবং প্রতিষ্ঠিত লোকজনদের সঙ্গে মিলিত হওয়া, সবই করতেন। রাতের পর রাত জাগা, কুপথ্য খাওয়া সবই চলত প্রতিদিন।

নাসিকে এক কার্যকর্তার বাড়িতে ভোজনের পর এক স্বয়ংসেবক ডাক্তার তাঁর গায়ে হাত দিয়ে চমকে ওঠেন।

ডাক্তারজীর তো বেশ জ্বর, ১০৩ ডিগ্রি হবে।

চলবে

বৈভবশালী ভারত নির্মাণের প্রথম ধাপ

অন্নানকুসুম ঘোষ

বাজেট কথাটার আক্ষরিক অর্থ হলো শুধুমাত্র আয়-ব্যয়ের হিসেব, কিন্তু নিজগুণে কোনো কোনো বাজেট এই নিতান্ত আয়-ব্যয়ের হিসেবের বাইরে আরও প্রভাব বিস্তারকারী হয়ে ওঠে। এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটও সেইরকম।

সাধারণত আমাদের দেশে সরকারের ঘোষিত লক্ষ্য থাকে গরিবদের উপকার করা আর ঘুরপথে উপকৃত হয় ধনীরা। এযাবৎকাল হওয়া প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রীয় বাজেট সেই পথেই চলেছিল। সোজাপথ বা বাঁকাপথ কোনো পথেই কক্ষে না পেয়ে পথে বসত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, তাদের কথা কেউই ভাবতো না। এবারের বাজেট সে দিক দিয়ে ব্যতিক্রম। শুধুমাত্র মধ্যবিত্তের কথা মাথায় রেখে এবারের বাজেটে আয়করে প্রচুর ছাড় দেওয়া হয়েছে। এর আগে রিবেট-সহ করমুক্ত আয়ের পরিমাণ ছিল বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা এবারও তাই আছে। এতদিন ৫ লক্ষের বেশি এবং সাড়ে সাত লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয়ের ব্যক্তিদের আয়করের হার ছিল ২০ শতাংশ বর্তমানে তা কমে হয়েছে মাত্র ১০ শতাংশ। সাড়ে সাত লক্ষের বেশি এবং ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উপার্জনকারী ব্যক্তিদেরও এতদিন কুড়ি শতাংশ করের হার ছিল এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৫ শতাংশে। ১০ লক্ষের বেশি এবং সাড়ে ১২ লক্ষ পর্যন্ত বার্ষিক আয়ের ব্যক্তিদের করের হার ছিল এতদিন ৩০ শতাংশ, বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২০ শতাংশে। সাড়ে ১২ লক্ষের বেশি কিন্তু ১৫ লক্ষের কম আয়ের ব্যক্তিদের আয়কর এতদিন ৩০ শতাংশ যা এখন কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৫ শতাংশ অর্থাৎ বলা যায় সব মিলিয়ে মধ্যবিত্তদের বিপুল পরিমাণ করছাড় মিলেছে।

এবারের বাজেটে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। বিষয়গুলি হলো (১) কৃষি এবং গ্রামীণ উন্নয়ন, (২) স্বাস্থ্য, (৩) শিক্ষা ও দক্ষতা। কৃষিক্ষেত্রে লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে ২০২৫ সালের মধ্যে কৃষকদের রোজগার দ্বিগুণ করার। এজন্য কৃষিক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। গত বছরের তুলনায় প্রায় চার শতাংশ ব্যয় বেড়েছে। এছাড়াও সরকার ঘোষণা করেছে কৃষিক্ষেত্রে বাজারকে খুলে দিয়ে সেখানে প্রতিযোগিতা এনে চাষকে লাভজনক করার চেষ্টা তারা করবে। অর্থাৎ বিদেশি কোম্পানিগুলি কৃষিপণ্যের বাজারে প্রবেশ করতে পারবে এবং সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করতে পারবে। এছাড়া চাষি নিজেদের জমি কর্পোরেট সংস্থার কাছে লিজ দিয়ে চুক্তি চাষ করতে পারবে, একথাও বলা হয়েছে। কৃষকদের এই প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে ওঠার উপযুক্ত করে তোলার জন্য ১০ লক্ষ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণের কথা ঘোষণা করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাজেটে। প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান যোজনার অধীনে যেসব কৃষক সরকারের কাছ থেকে চাষের খরচ বাবদ টাকা পেয়েছেন তারাই এই ক্ষুদ্র

ঋণের সুযোগ পাবেন বলে বলা হয়েছে। এখানে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের ভাগ্য কিন্তু খারাপ, রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থের শিকার হয়ে প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান যোজনার অর্থ পাননি তাঁরা। তাই এবারও ১৫ লক্ষ কোটি টাকার বিপুল পরিমাণ ক্ষুদ্রঋণের সুবিধা থেকে এরাজ্যের চাষিরা বঞ্চিত হবেন।

শিক্ষাক্ষেত্রেও সরকার ব্যয়বরাদ্দ প্রচুর বাড়িয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে গত বছরের তুলনায় প্রায় ৭ শতাংশ ব্যয়বরাদ্দ বেড়েছে, উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি ৩ শতাংশ। এক্ষেত্রে একটি কথা স্মর্তব্য, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে বেসরকারিকরণ চলছে এবং উচ্চশিক্ষা যারা নিচ্ছেন তাদের একটা বড় অংশ বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করছেন। সেক্ষেত্রে সরকারি ক্ষেত্রে ৩ শতাংশ ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি মানে সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধির হার অনেকটাই বেশি বলতে হবে। এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশের মাত্র ২৫ শতাংশ উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে। সরকারের এই ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধির কারণে আশা করা যায় এই সংখ্যা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। আরও একটি সদর্থক পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। প্রথাগত শিক্ষার বাইরে কারিগরি স্কিল ডেভেলপমেন্ট খাতে ৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রতিভাবান শিক্ষক নিয়োগ, উন্নত গবেষণাগার তৈরি এবং নতুন প্রযুক্তির বিকাশের জন্য এই অর্থ বিনিয়োগ করা হবে বলেই অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন। বর্তমান সরকারের প্রতি অনেকেরই অভিযোগ এই সরকার গোটা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে না, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয়তাবাদী হওয়ার কারণে শুধুমাত্র দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এবারের বাজেটের শিক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধেই কথা বলে। এবারের বাজেটে এশীয় ও আফ্রিকান পড়ুয়াদের জন্য ইন্ডিয়ান প্লাস্টিক অ্যাসেসমেন্ট টেস্টের মাধ্যমে বৃত্তিদানের ঘোষণা হয়েছে যার দ্বারা বিদেশি পড়ুয়াদের কাছে ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আকর্ষণীয় করে তোলা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। দূর শিক্ষার মাধ্যমকে আরও উন্নত করে তোলার জন্য এ বছরে ১০০টি এবং আগামী বছরের মধ্যে

এই বাজেট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভারতের অর্থনীতিকে ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করার প্রথম ধাপ। সরকার যে বৈভবশালী ভারত নির্মাণের কথা গুরুত্ব সবকারে ভাবছে এই বাজেট তারই প্রমাণ।

আরও ১৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ ধরনের পাঠ্যক্রম চালু করবে যাতে ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা কোর্স অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করতে পারবেন। যা আগামী দিনে দেশের কর্মসংস্থান বাড়াতে সাহায্য করবে। এছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রদের জন্য পুরসভা ও পঞ্চায়েতে ইন্টার্নশিপ প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব রয়েছে এবারের বাজেটে। যে সিদ্ধান্ত প্রযুক্তিবিদদের লব্ধ জ্ঞানকে দেশের উন্নতির কাজে লাগানোর জন্য একটি বড় পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়াও জাতীয় পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় ফরেনসিক বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় চালুর কথাও এবারের বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে যা সরকারের দূরদৃষ্টির পরিচয়বাহী।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকার ব্যয়বরাদ্দ ৪ শতাংশ বাড়িয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প যা গতবছর কেন্দ্রীয় সরকার চালু করেছে তার মাধ্যমে সারা দেশের প্রচুর মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। এর উপর স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আরও ৪ শতাংশ বরাদ্দ বাড়ানো হলো। তার ফলে বর্তমানে দেশের সাধারণ নাগরিকদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যায় অর্থ আর কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না বলেই মনে করা যায়। তবে এক্ষেত্রেও আমাদের রাজ্যের কপাল খারাপ। নিজেদের ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা নিচ্ছে না। ফলে দেশব্যাপী প্রচলিত এই বিরাট স্বাস্থ্যপরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। এছাড়াও ২০২৫ সালের মধ্যে দেশকে যক্ষামুক্ত করে তোলার যে লক্ষ্য কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে সেই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য এবছর বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে।

শুধুমাত্র কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নয়, পরিবেশের দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে এবারের বাজেটে। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো পরিবেশ দূষণজনিত সমস্যা। বিশ্ব উষ্ণায়ণ জনিত সমস্যা গোটা পৃথিবীর ভবিষ্যৎকে যখন অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তখন পরিবেশ দূষণের সবচেয়ে বড় মাধ্যম বায়ুদূষণ ঠেকানোর জন্য এবারের বাজেটে ৪ হাজার ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও এবারের বাজেটে একটি আপাতদৃষ্টিতে গুরুত্বহীন মনে হওয়া এবং সেই কারণে দীর্ঘকাল ধরে উপেক্ষিত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। সেই বিষয়টি হলো দেশের ইতিহাস তথা প্রত্নতত্ত্ব। ঐতিহাসিক বস্তুসমূহের বা স্থানসমূহের উপযুক্ত গবেষণা ও সংরক্ষণের অভাব। মিশর, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশ নিজেদের প্রত্নবস্তুগুলির উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে প্রত্ন- পর্যটন-নির্ভর অর্থনীতিতে যতখানি অগ্রসর হতে পেরেছে ভারত তার ধারেকাছেও আসতে পারেনি। এবারের বাজেটে সর্বপ্রথম এদিকে নজর দেওয়া হয়েছে। দেশের প্রাচীনতম সমুদ্রবন্দর লোথাল, প্রাচীনতম রাজধানী হস্তিনাপুর-সহ মোট পাঁচটি জায়গায় প্রত্নতত্ত্ব সংরক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার কথা এবারের বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া দেশের জাদুঘরগুলিকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর জন্য এবারের বাজেটে বিপুল অর্থ বরাদ্দ হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে, এই বাজেট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভারতের অর্থনীতিকে ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করার প্রথম ধাপ। সরকার যে বৈভবশালী ভারত নির্মাণের কথা গুরুত্ব সবকারে ভাবছে এই বাজেট তারই প্রমাণ। ▮

বাংলাদেশে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার সংখ্যা বাড়ছে

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। বাংলাদশে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার ঘটনা নতুন নয়। সম্প্রতি এক ইসলামি মাহফিলে একটি বড়ো ধর্মান্তরণের ঘটনায় হিন্দুদের মধ্য গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, আলোচনা হচ্ছে ব্যাপকভাবে। গত ২৪ জানুয়ারি লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার পানপাড়া গ্রামে বাংলাদেশের ইসলামি বক্তা মিজানুর রহমান আজহারি তারই এক মাহফিল ১২ জন হিন্দুকে ইসলামে ধর্মান্তরি করেন। এই ঘটনা ব্যাপক ক্ষোভ ও বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। ধর্মান্তরিত হিন্দু পরিবারটি এসেছিল ভারত থেকে। বাংলাদেশ পুলিশ সবাইকেই আটক করে এবং পরে তাদের ভারতে ফেরত পাঠানো হয়।

ওই ঘটনা বাংলাদেশে হিন্দুদের ব্যাপকভাবে মুসলমান বানানোর উগ্র তৎপরতার দিকটি ব্যাপকভাবে সামনে নিয়ে আসে। এই ঘটনা আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে খবর হয়। সমালোচনা শুরু হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। অস্বস্তির মুখে পড়ে বাংলাদেশ সরকার আজহারিকে ছুটি নিয়ে আপাতত বিদেশে চলে যেতে বলে। জানা গেছে, তিনি মালেশিয়ায় গেছেন। যাবার আগে ২৯ জানুয়ারি তিনি তাঁর ফেসবুক পাতায় এক পোস্টে লেখেন, 'পারিপার্শ্বিক কারণে এবং গবেষণার জন্য আমি আগামী মার্চ পর্যন্ত সব ওয়াজ মাহফিল বন্ধ রেখে মালেশিয়া যাচ্ছি। পারিপার্শ্বিক কিছু কারণে এখানেই এবছরের তাফসির কর্মসূচির ইতি টানতে হচ্ছে। তাই, আগামী মার্চ পর্যন্ত আমার বাকি কর্মসূচিগুলো স্থগিত করা হলো।'

বাংলাদেশে প্রায় প্রতি মাসেই ধর্মান্তরিত করার ঘটনা ঘটে। লক্ষ্মীপুরে এর আগেও ধর্মান্তরিত করার ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন কমিটি জানিয়েছে, গত মাসে বিশ্ব ইজতেমায় গাজিপুরের আওয়ামি লিগ মেয়রের উপস্থিতিতে এক হিন্দুকে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ধর্মান্তরিত করা হয়। এর আগে গাজিপুরের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী ও আওয়ামি লিগের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক শেখ আবদুল্লাহর উপস্থিতিতে এক ইসলামি জলসায় অনুরূপ ধর্মান্তরিত করার ঘটনা ঘটে।

মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইট ওয়াজের সভাপতি অ্যাডভোকেট রবীন্দ্র ঘোষ বলেছেন, অপহরণ কিংবা জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করা হয়। এদের বেশিরভাগই কিশোরী ও স্কুলছাত্রী। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা এই সংগঠনের মাধ্যমে প্রশাসনের সহায়তায় কিছু মেয়েকে উদ্ধার করেছেন। সব চেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে ঠাকুরগাঁও জেলায়। রানিশংকৈল ও হরিপুর উপজেলা থেকে অপহৃত ও ধর্মান্তরিত স্কুলছাত্রীরা হচ্ছে স্মৃতি রানি, নিপা রানি বর্মণ, পূজারানি বণিক, সুচিত্রা রানি ও তন্নি পাল। তাদের বয়স ১৫ থেকে ১৭ বছর। শ্রীঘোষ আরও জানান, অনেক ক্ষেত্রে উদ্ধারের পর বাবা-মা মেয়ের নাম প্রকাশ করতে রাজি হন না। তা সত্ত্বেও তাঁরা আইনি সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রতি মাসেই ধর্মান্তরিত করার ঘটনা ঘটছে।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সম্পাদক রাণা দাশগুপ্ত এই প্রতিনিধিকে জানান, বাংলাদেশে জোর করে ধর্মান্তরিত করার ঘটনা বেড়ে গেছে। বিশেষ করে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকে। তিনি নির্বাচনের পর চার মাসের পরিসংখ্যান তুল ধরে বলেন, মার্চ মাসে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে ৮ জনকে, এপ্রিল মাসে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৬। পরের মাসগুলোতেও ধর্মান্তরিত করার ঘটনা ঘটেছে। হিন্দু সমাজের কিশোরী ও যুবতীদের অপহরণ কিংবা জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্মান্তরিত করা হয়। শ্রীদাশগুপ্ত আরও বলেন, মূলত হিন্দু মেয়েদের প্রলুব্ধ করে কিংবা জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করা হচ্ছে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছ হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করা ও দেশত্যাগে বাধ্য করা। তিনি বিভিন্ন ইসলামি মাহফিলে বক্তাদের বক্তব্য নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অনেক মাহফিলে হিন্দুবিদ্বেষ ছড়ানোর পাশাপাশি ধর্মান্তরিত করার প্ররোচনা দেওয়া হয়। হিন্দু মহাজোটের দুই অংশের নেতা গোবিন্দ প্রামাণিক ও পলাশ সরকারও বলেছেন, ধর্মান্তরিত করার ঘটনায় তাঁরা উদ্বিগ্ন। মহাজোটের দুই অংশ থেকে দেওয়া পরিসংখ্যানে ২০১৮ ও ২০১৯ সালের প্রতি মাসে গড়ে অন্যূন তিনজনকে ধর্মান্তরিত করার কথা বলা হয়েছে। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি মানবাধিকার সংগঠন আর্টিকেল ১৯ এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স (বিলিয়া)-র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'ইউকে-ইউএন অ্যাডভোকেসি ওয়ার্কশপ'-এ অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের নেতারাও হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার বিষয়টি উত্থাপন করেন। তাঁরা বলেন, এনিয়ে সংখ্যালঘুদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ■

কলকাতা মেট্রোর ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের প্রথম পর্যায়ের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল সম্প্রতি কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে কলকাতা মেট্রোর ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরে মেট্রো পরিষেবার যাত্রা সূচনা করেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি একাধিক রেল প্রকল্পও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। অনুষ্ঠানে শ্রীগোয়েল বলেন, হাওড়া ময়দান পর্যন্ত সমগ্র ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো করিডরের কাজ ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ শেষ হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, শহরবাসীরা পরিবহণ মাধ্যম হিসাবে মেট্রো পরিষেবাকে প্রাধান্য দেবেন। বর্তমানে কলকাতার মেট্রো পরিষেবা উত্তর-দক্ষিণ করিডরে চালু রয়েছে। এই পরিষেবা নোয়াপাড়া থেকে কবি সুভাষ স্টেশন অবধি পাওয়া যায়। ২৭.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই পরিষেবার সূচনা হয় ৩৬ বছর আগে ১৯৮৪ সালে। শ্রীগোয়েল হাওড়া ও মালদা ডিভিশনের কাটোয়া-আজিমগঞ্জ এবং মণিগ্রাম-নলহাটি শাখা বৈদ্যুতিকীকরণের পর তা জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। ১৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই শাখায় বৈদ্যুতিকীকরণের কাজে প্রায় ২১৯ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এই শাখায় বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় ট্রেন পরিষেবা আরও সুগম হবে। একইভাবে, জ্বালানি হিসাবে ডিজেলের ব্যবহার কমবে। পূর্ব রেলের ৮৩ শতাংশ রুটেই বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ শেষ হয়েছে বলে জানিয়ে শ্রীগোয়েল আশা প্রকাশ করেন, বাকি অংশে বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ ২০২১ সাল নাগাদ শেষ হবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরিকল্পনাগুলির কথা বিবেচনায় রেখে এবং ভারতীয় রেল ব্যবস্থাকে পরিবেশ-বান্ধব পরিবহণ মাধ্যম হিসাবে গড়ে তুলতে পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার এবং সৌরশক্তির ব্যবহার বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই লক্ষ্যে শ্রীগোয়েল হাওড়া স্টেশনের ছাদে গড়ে ওঠা ৩ মেগাওয়াট সৌরশক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ইউনিট জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। এই ইউনিট থেকে আগামী ২৫ বছর ইউনিট প্রতি ৩ টাকা ৬২ পয়সা দরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। এমনকি, এই ইউনিট থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুতের ফলে আগামী ২৫ বছরে প্রায় ৪০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। এছাড়াও, শ্রীগোয়েল হাওড়া, মালদা, শিয়ালদহ ডিভিশনে ৪১.১৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ডবল বা তৃতীয় লাইন জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। এই কাজে খরচ হয়েছে প্রায় ৫৫০ কোটি টাকা। মন্ত্রী অনুষ্ঠান-স্থল থেকে ভিডিয়ো লিঙ্কের মাধ্যমে ১৩০৬৪ নম্বর বালুরঘাট-হাওড়া এক্সপ্রেসের যাত্রা সূচনা করেন। বর্তমানে এই ট্রেনটির পরিষেবা দ্বিসাপ্তাহিক থেকে বাড়িয়ে সপ্তাহে পাঁচ দিন করা হয়েছে। পরিষেবা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কলকাতার সঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মানুষের যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৬.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো হুগলি নদীর পশ্চিমপাড়ে হাওড়ার সঙ্গে পূর্বপাড়ে সল্টলেকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবে।

কলকাতায় করোনা ভাইরাসের ওপর জনসচেতনতামূলক উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কলকাতায় করোনা ভাইরাসের বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সম্প্রতি বিজ্ঞান সংগ্রহশালাগুলির জাতীয় পর্ষদের উদ্যোগে দুটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সায়েন্সসিটিতে ৭ ফেব্রুয়ারি করোনা ভাইরাসের বিষয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীতে ইউনেস্কোর প্রাক্তন উপদেষ্টা, ইন্ডিয়া হাউসের নির্দেশক ডাঃ বিকাশ সি সান্যাল একটি মতবিনিময় কর্মসূচিতে যোগ দেন, যেখানে শহরের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ছাড়াও বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন। সায়েন্সসিটির নির্দেশক শুভব্রত চৌধুরী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের কাছে আবেদন রাখেন, তাঁরা যেন এই আলোচনাসভার বিষয়গুলি তাঁদের পরিচিতদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। এই প্রদর্শনীটি চলবে ৮ মার্চ পর্যন্ত। অপর এক অনুষ্ঠানে বিড়লা কারিগরি ও প্রযুক্তি সংগ্রহশালা (বিআইটিএম) সম্প্রতি নোভেল করোনা ভাইরাস নিয়ে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে কলকাতার অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অব হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ্-এর হেলথ্ প্রমোশন অ্যান্ড এডুকেশন দপ্তরের ডাইরেক্টর-প্রফেসর ডাঃ মধুমিতা দোবে, জনস্বাস্থ্য প্রশাসন দপ্তরের ডাইরেক্টর-প্রফেসর ডাঃ রমেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, ইন্ডিয়ান ডায়াটেটিক অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও পুষ্টিবিদ শ্রীমতী মিতালি পালধি উপস্থিত ছিলেন।

জম্মুতে এইমসের ধাঁচে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্রীয় কর্মীবর্গ, গণ-অভিযোগ ও পেনশন বিষয়ক মন্ত্রী ডা: জিতেন্দ্র সিংহ সম্প্রতি জম্মুতে এক অনুষ্ঠানে এইমসের ধাঁচে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ভূমি পূজা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এই উপলক্ষ্যে ড. সিংহ বলেন, জম্মু ও কাশ্মীর হলো দেশের একমাত্র কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল যেখানে দুটি এইম্স-এর ধাঁচে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। এর একটি গড়ে উঠবে জম্মুতে এবং অপরটি কাশ্মীরে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মতোই কেন্দ্রশাসিত জম্মু ও কাশ্মীরের সার্বিক উন্নয়নে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন, সে ব্যাপারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ডাঃ সিংহ বলেন, এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে দুটি এইম্স চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পাশাপাশি, নয়টি মেডিক্যাল কলেজ তৈরিরও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে সরকারের নতুন কর্মসংস্কৃতির ফলে সাধারণ মানুষ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, কেন্দ্রীয় সরকার গত জানুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনার আওতায় জম্মু অঞ্চলের সাম্বা জেলার বিজয়পুরে এইমসের ধাঁচে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রস্তাব অনুমোদন করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত

বছরের ৩ ফেব্রুয়ারি জম্মু এইম্স-এর শিলান্যাস করেন। এই চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান নির্মাণে খরচ ধরা হয়েছে ১,৬৬১ কোটি টাকা। সিপিডব্লিউডি এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলবে। ২০২২-এর আগস্ট মাস নাগাদ কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি ২২,৩১৫ বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে গড়ে তোলা হচ্ছে। কাজ শেষ হলে জম্মুর এই এইম্স চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে সুপার স্পেশালিটি বিভাগ সহ ৭৫০ রোগীশয্যার সুবিধা থাকবে। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটি মেডিক্যাল কলেজ ও নার্সিং কলেজও গড়ে উঠবে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সবরকম সুবিধাযুক্ত করে প্রতিষ্ঠানটিকে পরিবেশ-বান্ধব ভবন হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের ওপর ভিত্তি করে রান্নার গ্যাসের মূল্য স্থির হয়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এলপিজি-র মূল্য আন্তর্জাতিক বাজার দরের ওপর স্থির হয়। বিগত মাসে আন্তর্জাতিক বাজারে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস বা এলপিজি-র যে মূল্য ছিল, তার ওপর নির্ভর করে গ্যাসের মূল্য স্থির হয়। কেন্দ্রীয় সরকার 'পহল' কর্মসূচির আওতায় গ্রাহকদের রান্নার গ্যাসে ভরতুকি দিয়ে থাকে। তবে, 'পহল' কর্মসূচির গ্রাহকদের নগদ সুবিধা হস্তান্তর ব্যবস্থার মাধ্যমে যে ভরতুকি দেওয়া হয়, তা বাজার নির্ধারিত মূল্য এবং ভরতুকিযুক্ত মূল্যের থেকে পৃথক। বর্তমানে জাতীয় স্তরে রান্নার গ্যাসের পরিধি ৯৭ শতাংশের বেশি এবং রান্নার গ্যাসের সংযোগ সংখ্যা ২৭ কোটি ৭৬ লক্ষেরও বেশি। গ্যাসের গ্রাহক সংখ্যা ২৬ কোটি ১২ লক্ষ বৃদ্ধি পাওয়ায় ভরতুকিবাবদ অতিরিক্ত অর্থ সরকার বহন করে।

গত মাসে এলপিজি-র আন্তর্জাতিক মূল্য প্রতি মেট্রিক টনে ৪৪৮ মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে হয়েছে ৫৬৭ মার্কিন ডলার। স্বাভাবিকভাবেই ১৪ কিলো ২০০ গ্রাম ওজনের সিলিন্ডারের মূল্যও বেড়েছে ১৪০ টাকা ৫০ পয়সা। অন্যদিকে, দিল্লিতে ভরতুকিবিহীন এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ৭১৪ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৮৫৮ টাকা ৫০ পয়সা। একইভাবে, গ্রাহকদের প্রদেয় ভরতুকির মূল্য সিলিন্ডার প্রতি ১৫৩ টাকা ৮৬ পয়সা থেকে বেড়ে হয়েছে ২৯১ টাকা ৪৮ পয়সা। তাই, আন্তর্জাতিক বাজারে এলপিজি-র মূল্যের ওঠা-নামা গ্রাহকদের কিছুটা সুরক্ষা দিতে সরকার রান্নার গ্যাসের গ্রাহকদের নির্দিষ্ট অঙ্কে ভরতুকি দিয়ে থাকে। গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত ১৪ কেজি ২০০ গ্রাম ওজনের সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে সরকার প্রদেয় ভরতুকির পরিমাণ ১৫৩ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ২৯১ টাকা ৪৮ পয়সা। 'প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা'র সুবিধাভোগীদের ক্ষেত্রে ভরতুকির পরিমাণ সিলিন্ডার প্রতি ১৭৪ টাকা ৮৬ পয়সা থেকে বেড়ে ৩১২ টাকা ৪৮ পয়সা হয়েছে। এই পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে 'প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা'র সুবিধাভোগীদের জন্য এবং ভরতুকিযুক্ত সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে ভরতুকি মূল্য বৃদ্ধিবাবদ বেশিরভাগ খরচই সরকার বহন করে।

পাক-অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীর থেকে আগত বাস্তুচ্যুত মানুষের পুনর্বাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাকিস্তান অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীর থেকে বাস্তুচ্যুত মানুষের পুনর্বাসনের জন্য গৃহীত উদ্যোগ সম্পর্কে এক

প্রশ্নের লিখিত জবাবে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জি কিষান রেড্ডি সম্প্রতি লোকসভায় জানান, ১৯৪৭-এর ভারত-পাক যুদ্ধের পর পাকিস্তান অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীর থেকে মোট ৩১, ৬১৯টি বাস্তুচ্যুত পরিবার নথিভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ২৬,৩১৯টি পরিবারকে পূর্বতন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। নথিভুক্ত বাকি ৫,৩০০ পরিবার দেশের বিভিন্ন অংশে বসবাসের জন্য চলে যায়। ১৯৬৫ ও ১৯৭১-এর ভারত-পাক যুদ্ধের সময় ছাম্ব নিয়াবত এলাকা থেকে ১০,০৬৫টি পরিবার উদ্বাস্তু হিসেবে নথিভুক্ত হয়। কেন্দ্র এবং জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসন পাক অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীর সহ ছাম্ব এলাকার বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলির জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসনের বিভিন্ন প্রকল্প চালাচ্ছে।

১৯৪৭-এর যুদ্ধের সময় জম্মু-কাশ্মীরেই থেকে যাওয়া বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলিকে জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন পরিবারপিছু ৪ থেকে ৮ একর পর্যন্ত কৃষি জমি দিয়েছে। যাঁরা শহর এলাকায় বসবাসের জন্য চলে গিয়েছেন তাঁদের জমি বা কোয়ার্টার্স দেওয়া ছাড়াও পরিবার প্রতি ৩,৫০০ টাকা নগদ অনুদান দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত পরিবার জমি পায়নি, তাদের ক্ষতিপূরণ বাবদ সরকারের পক্ষ থেকে নগদ অর্থ দেওয়া হয়েছে। অন্য পরিবারগুলির পুনর্বাসনের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী জমি বা কোয়ার্টার্স দেওয়া হয়েছে। যেসব বাস্তুচ্যুত পরিবার জম্মু-কাশ্মীরে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেয়নি তাদের রেজিস্ট্রেশনের সময় পরিবার প্রতি ৩,৫০০ টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে।

১৯৬৫ ও ১৯৭১-এর যুদ্ধের সময় বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলিকে ৪ একর সেচযুক্ত অথবা ৬ একর সেচ বহির্ভূত জমি দেওয়া হয়েছে। ১৯৬৫-র যুদ্ধের সময় বাস্তুচ্যুত প্রত্যেক পরিবারকে ৩ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ এবং '৭১-এর যুদ্ধের সময় পরিবার প্রতি ৭,৫০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত পরিবার ১৯৬৫-র যুদ্ধের সময় সরকারি শিবিরে না থাকার সিদ্ধান্ত নেয়, তাদেরকেও পরবর্তী সময়ে পরিবার পিছু ২৫ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে।

বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলির দুঃখদুর্দশা লাঘব করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৫-তে প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়নমূলক প্যাকেজের আওতায় ২০১৬-র ২২ ডিসেম্বর ২ হাজার কোটি টাকার পুনর্বাসন প্যাকেজ অনুমোদন করে। এই প্যাকেজের আওতায় পাকিস্তান অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীর এবং ছাম্ব এলাকার ৩৬, ৩৮৪টি বাস্তুচ্যুত পরিবারের যারা জম্মু-কাশ্মীরেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তাদের ৫,৫০,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

'অর্থ-গঙ্গা' কর্মসূচি গঙ্গানদী তীরবর্তী অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্রীয় জাহাজ চলাচল প্রতিমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডভিয়া সম্প্রতি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণের ক্ষেত্রে 'অর্থ-গঙ্গা' কর্মসূচি এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এই কর্মসূচি সামগ্রিক বিকাশের পাশাপাশি, জাতীয় জলপথগুলিকে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি আরও বলেন, গঙ্গানদী সংলগ্ন এলাকায় দেশে প্রায় অর্ধেক মানুষ বসবাস করেন। এমনকী, দেশে জলপথে পরিবাহিত পণ্যসামগ্রীর এক-পঞ্চমাংশ এই নদীপথ দিয়েই পরিবহণ হয়ে থাকে। মন্ত্রক বিগত কয়েক বছরে অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণ ব্যবস্থার সার্বিক বিকাশে যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তারফলে জলপথে পণ্য পরিবহণের পরিমাণ ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ৭০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং জলযানের পরিষেবা ৩০০ থেকে বেড়ে ৭০০ হয়েছে। ছোট জেটিগুলির মানোন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বারাণসী থেকে হলদিয়া পর্যন্ত প্রায় ১ হাজার ৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ১ নম্বর জাতীয় জলপথে কৃষক, ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের যোগাযোগের স্বার্থে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাপনে মানোন্নয়ন ঘটবে এবং সহজে ব্যবসাবাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠবে। শ্রী মাণ্ডভিয়া আরও জানান, উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে 'ফ্রেইট ভিলেজ' এবং ঝাড়খাণ্ডের সাহিবগঞ্জে শিল্প তালুক তথা লজিস্টিক পার্ক গড়ে তোলার জন্য ২০০ কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের পাশাপাশি, স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশ ঘটবে।

‘কাশী এক, রূপ অনেক’ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন ভারত ৫ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের অর্থনীতি হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। বারাণসীতে সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, পরম্পরাগত কারুশিল্পী এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থাগুলি এই উদ্দেশ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

বারাণসীর বড়লালপুরে দীনদয়াল উপাধ্যায় বাণিজ্য সহায়তা কেন্দ্রে আয়োজিত ‘কাশী এক, রূপ অনেক’ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলার এবং কাশীর তন্তুবায় ও কারু শিল্পীদের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রীর প্রদর্শনী তিনি ঘুরে দেখেছেন। ‘এক জেলা এক পণ্য’ কর্মসূচির আওতায় তিনি বিভিন্ন স্টল যেমন—তাঁতবস্ত্র, কাঠের তৈরি পুতুল, কনৌজের সুগন্ধি, মোরাদাবাদের মেটাল ক্র্যাফ্ট, লক্ষ্ণৌর চিকনকারি, আজমগড়ের ব্ল্যাক পটারি ঘুরে দেখেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন হস্তকলা ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের সহায়ক সাজসরঞ্জাম এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন।

ভারতীয় পণ্য সামগ্রীকে আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে উত্তরপ্রদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলির প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারের এক জেলা এক পণ্য কর্মসূচির ফলে বিগত দুই বছরে এখানে থেকে রপ্তানির পরিমাণ লক্ষণীয় হারে বেড়েছে। এছাড়াও উত্তরপ্রদেশ সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় তন্তুবায় ও হস্তশিল্পীদের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ও ঋণ সহায়তা প্রদান করছে। শ্রী মোদী বলেন, উত্তরপ্রদেশে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিদেশের বাজারে এমনকী অনলাইনে পৌঁছে যাওয়ায় দেশ উপকৃত হবে।

তিনি বলেন, ভারতের প্রতিটি জেলা তার নিজস্ব শিল্পকলা, ভিন্ন ভিন্ন পণ্য সামগ্রীর মাধ্যমে পৃথক পরিচিতি পেতে পারে। মেক ইন ইন্ডিয়া এবং এক জেলা এক পণ্যের মতো বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে জেলাওয়াড়ি পৃথক পরিচিতি বড়ো প্রেরণার কাজ করে শ্রী মোদী অভিমত প্রকাশ করেন।

তিনি জানান, বিগত দুই বছরে রাজ্যের ৩০টি জেলা থেকে ৩ হাজার ৫০০-র বেশি

হস্তশিল্পী উত্তরপ্রদেশ ইন্সটিটিউট অব ডিজাইনের পক্ষ থেকে সাহায্য পেয়েছে। এছাড়াও ১ হাজারেরও বেশি শিল্পীকে সহায়ক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। হস্তশিল্পী, কারুশিল্পী ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা জোগানোর জন্য তিনি উত্তরপ্রদেশ ইন্সটিটিউট অব ডিজাইনের ভূমিকার তিনি প্রশংসা করেন।

ভারতে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর গুণমান বাড়ানোর ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একবিংশে শতাব্দীর চাহিদা অনুযায়ী দেশের ঐতিহ্যবাহী শিল্পক্ষেত্রগুলিকে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার পাশাপাশি আর্থিক সহায়তা, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং বিপণন সহায়তা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। তিনি বলেন, ‘বিগত ৫ বছরে আমরা এই লক্ষ্যে লাগাতার প্রয়াস নিয়ে চলেছি। আমরা এমন এক লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছি যেখানে দেশের প্রতিটি মানুষের ক্ষমতায়ণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।’

শিল্প ও সম্পদ সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলির সহায়তায় গৃহীত একাধিক পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এবারের বাজেটে উৎপাদন ক্ষেত্র-সহ সহজে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, জাতীয় কারিগরি বস্ত্র মিশন চালু করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এজন্য দেড় হাজার কোটি টাকার সংস্থান হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে প্রতিরক্ষা করিডরের জন্য ৩ হাজার ৭০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে জানিয়ে শ্রী মোদী বলেন, ছোটো শিল্প সংস্থাগুলিও এই করিডর থেকে উপকৃত হবে এবং কর্মসংস্থানের নতুন নতুন সুযোগ তৈরি হবে।

সরকারি ই-বাজার ব্যবস্থা বা জিইএম-এর কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই উদ্যোগের ফলে ছোটো শিল্পসংস্থগুলি তাদের উৎপাদিত সামগ্রী সরকারকে বিক্রি করার ক্ষেত্রে লাভবান হচ্ছে। অভিন্ন সংগ্রহ ব্যবস্থা কার্যকর হলে এক মঞ্চ থেকেই সরকার ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থাগুলির উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রী ও পরিষেবা সংগ্রহ করতে পারবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই প্রথমবার দেশে জাতীয় লজিস্টিক বা পণ্য পরিবহণ নীতি তৈরি করার কাজ চলছে। এই নীতি ই-লজিস্টিক ক্ষেত্রে একক জানালা ব্যবস্থার সূচনা হবে যার ফলে ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থাগুলির মধ্যে আরও প্রতিযোগিতার প্রসার ঘটবে এবং কর্মসংস্থান বাড়াতে সাহায্য করবে। ■

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

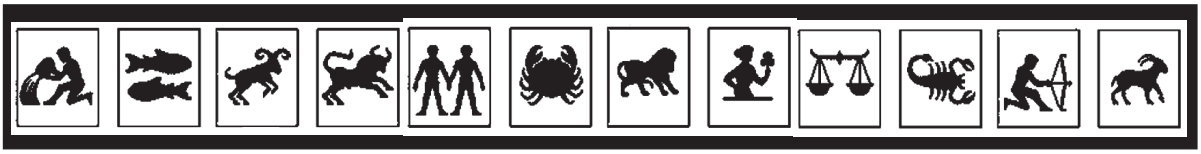

২৪ ফেব্রুয়ারি, (সোমবার) থেকে ১ মার্চ (রবিবার) ২০২০। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রাহু, ধনুতে মঙ্গল, বৃহস্পতি, কেতু, মকরে শনি, কুম্ভে রবি, বক্রী বুধ, মীনে শুক্র। ২৯-০২ শনিবার, রাত্রি ১২-৩২ মিনিটে শুক্রের মেষে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র কুম্ভে শতভিষা নক্ষত্র থেকে মেষে ভরণী নক্ষত্রে।

মেষ : পারিবারিক দায়িত্ব পালন, অনুষ্ঠান আড়ম্বরে মাত্রাতিরিক্ত খরচ। বিদ্যার্থীর বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানান্বেষণের সার্থক প্রয়াস। জীবনসঙ্গীর নামে ব্যবসায় প্রাপ্তি, বিশিষ্টজনের সহায়তায় সামাজিক সম্মান ও প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। মুখমিষ্টতায় পরচিত্ত জয়। বিবাহ প্রার্থীর হঠাৎ বিবাহ সম্পন্ন। কর্মক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি বিষয়ে সজাগ ও হঠকারী সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকুন। পারিবারিক পরিবেশ ও মাতার স্বাস্থ্য বিষয়ক উদ্বেগ।

বৃষ : পরিবার ও ব্যবসায় অবাঞ্ছিত মন্তব্যে অস্বস্তি, যদিও পিতা-মাতার সহযোগিতা ঐশ্বরিক আশীর্বাদ তুল্য মনে হবে। সংসারে নতুন অতিথির আগমন এবং ব্যয়বাহুল্য বজায় থাকবে। কর্তৃপক্ষের সুনজরে থাকায় পদোন্নতি ও অদ্ভুত ধরনের নতুন অভিজ্ঞতা লাভ ও প্রবাস। সপ্তাহের প্রান্তভাগে উৎসাহ-উদ্দীপনায় অভিপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হবেন এবং পারিবারিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি। বন্ধুবান্ধব ও হিতৈষীদের ভালোবাসা লাভ।

মিথুন : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এবং উচ্চশিক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফল। অবিবাহিতদের বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার অনুকূল পরিবেশ। সামাজিক কাজকর্মে ভূয়সী প্রশংসা অর্জিত হলেও পেশাগত দিকে শত্রুদের মাত্রাতিরিক্ত দাপাদাপি যা ছন্দময় স্বাভাবিক জীবনের প্রতিবন্ধক। মানসিক দুশ্চিন্তা দূরীকরণে জীবনসঙ্গীর সহযোগিতায় প্রশমিত হবে। বয়স্কা ব্যক্তিদের রুটিন মাফিক ওষুধ সেবন ও চলাফেরা প্রয়োজন।

কর্কট : পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনে অনেক হিতকর কর্ম সম্পাদনে সকলের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও ভক্তি অর্জন। কর্মক্ষেত্রে প্রতিভার ব্যাপ্তি ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শুভদৃষ্টি ও উদার হৃদয়ের প্রকাশ। সারা সপ্তাহ শরীরের ও স্বাস্থ্যের যত্নের প্রয়োজন। নারী জাতিকাদের প্রতিষ্ঠা ও সুনাম। ভালোবাসার বাতাবরণে পারিবারিক শুচিতা ও শুভ্রতার দিকে গতি বিস্তার। চলাফেরায় সতর্ক ও বাক্‌সংযমী হওয়া প্রয়োজন।

সিংহ : জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রচেষ্টায় সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তির প্রকাশ। বিষয় সম্পত্তি রক্ষণে ব্যয়বৃদ্ধি হলেও একাধিক পন্থায় অর্থাগমের সম্ভাবনা। নিজ দক্ষ পরিচালনা ও অধস্তনের বক্তব্য ও কর্মপন্থার মেলবন্ধনে অফিসের নতুন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। সন্তান- সন্ততির শিক্ষাখাতে অধিক ব্যয় যোগ।

কন্যা : বিদ্যার্থীর অসামান্য কৃতিত্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কার লাভ। পূর্বের ঋণমুক্তি ও আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি। পরিবার-পরিজন-সহ আনন্দময় নৈসর্গিক স্থানে ভ্রমণ। পেশাগত জীবনে উচ্চ পদস্থ ও অধীনস্থদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। জীবনসঙ্গীর পছন্দমতো কর্মলাভ ও ব্যবসায়ীদের নতুন উদ্যোগে সাফল্য।

তুলা : নিকটজনের অশুভ খবর, পরিবারের আশাআকাঙ্ক্ষা পূরণে বিলম্ব ও ব্যর্থমনোরথ, কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অধরা থাকবে। প্রতিবেশীর কৌতূহল বুদ্ধিমত্তায় মোকাবিলা করুন। পারিবারিক পরিস্থিতি ও মাতার স্বাস্থ্যাবনতিতে উদ্বেগ। আপনার অভিধানে অসুখ নেই কিন্তু মানসিক অস্থিরতা ছায়াসঙ্গী। ধৈর্য ও মনসংযোগ বিদ্যা ও জ্ঞানার্জনের মাপকাঠি।

বৃশ্চিক : শান্ত, সংযত ভাবে কর্মপরিকল্পনায় পদক্ষেপ নিন। সামান্য ভুলভ্রান্তির প্রভূত ক্ষতির সম্ভাবনা। বন্ধু প্রতিবেশী ও কর্মক্ষেত্রে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। ঋণদান, আর্থিক অনুমোদনে কাউন্সিলিং প্রয়োজন। বিনিয়োগে বিরত থাকা শ্রেয়। নারী জাতিকাদের দুশ্চিন্তায় শান্তির অভাব এবং সুগার, প্রেসার ও হজমের গোলমালে যত্নের প্রয়োজন।

ধনু : কঠিন সিদ্ধান্তে আশা পূর্তি। ঝুলে থাকা কাজের বাস্তবায়ন সমাজ সেবায় মানবদরদির আখ্যায় ভূষিত, ব্যবসায়ীদের পর্যালোচনায় বিনিয়োগে শুভ। গৃহে নতুন অতিথির আগমন, নিজ উদ্যোগে আত্মপ্রতিষ্ঠা। গৃহস্থালির জিনিসপত্র ক্রয় ও উপহার সামগ্রী প্রাপ্তি। শরীরের মধ্যভাগের চোট, আঘাত ও অস্ত্রোপচারের সম্ভাবনা।

মকর : উত্তেজিত ক্রোধে শারীরিক অসুস্থতা। বিদ্যার্থীদের আধুনিক মনস্কতায় জ্ঞান ও বিদ্যায় আশানুরূপ ফল লাভে বাধা। প্রেমের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল হওয়া প্রয়োজন। অর্থনৈতিক দুরবস্থার অবসানে ধনধান্যে সুস্থ পরিবেশে পরিবারে ও বাইরের জগতে সুখ্যাতি লাভ। লেখক ও কবিত্ব শক্তির প্রভায় পাঠক সমাজে সমাদর লাভ।

কুম্ভ : পুলিশ, মিলিটারি, বিএসএফ, ক্রীড়াবিদের বিশেষ সম্মান। জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্য সচেতনতা দরকার। কর্মপ্রার্থীরা নতুন কর্মে যোগদান করতে পারে। ডিপার্টমেন্টাল হেড হওয়ার সুযোগ। সহৃদয় বন্ধু সমস্যা সমাধানের সহায়ক, রাজনীতিজ্ঞদের ব্যস্ততা ও ইতিবাচক পদক্ষেপে সাধুবাদ প্রাপ্তি। প্রবাসী আত্মীয়ের স্বদেশে প্রত্যাগমন।

মীন : অদৃশ্যভাবে অনেক আটকে থাকা কাজের সমাপ্তি। কর্মস্থানে প্রতিদ্বন্দ্বীরা পরাজিত হবে। অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতায় আত্মীয়তা বিঘ্নিত হবে। প্রেমের প্রথম পর্যায়ের সূচনা। বিরোধিতায় চিত্তচাঞ্চল্য। সপ্তাহের প্রান্তভাগে বিজাতীয় সংস্পর্শে ভাগ্যাকাশে উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা ও জীবনের নতুন দিশা।

● *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

—শ্রী আচার্য্য